পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ২২ ।। সংখ্যা ৪৪ ও ৪৫ ।। ১২ মে ও ১৯ মে ১৯৮৯
২৯ বৈশাখ ও ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬

রবীন্দ্রসংখ্যা ১৩৯৬





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ বিজয় বাসফোর

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

পশ্চিমবঙ্গ

রবীন্দ্রসংখ্যা ● ১২-১৯ মে ১৯৮৯

বিষয়সূচি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার এই বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যায় প্রচ্ছদে ব্যবহৃত প্রতিকৃতি, চিত্রাবলী, রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র, রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র ভবনের এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রদর্শশালার সৌজন্যে।

এই সংখ্যার দাম ঃ এক টাকা

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ২২ ।। সংখ্যা ৪৪ ও ৪৫ ।। ১২ মে ও ১৯ মে ১৯৮৯ ।। ২৯ বৈশাখ ও ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬

নিরক্ষরতা দূর করতে সারা দেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন

—মুখ্যমন্ত্রী

৮ মে, ১৯৮৯ রবীন্দ্রসদনের বিপরীত দিকের মেলা প্রাঙ্গণে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে এক সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষকে শিক্ষার যে সুযোগ প্রদান করার কথা ভেবেছিলেন আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের দেশে এখনও অসংখ্য মানুষ নিরক্ষর। তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সারা পৃথিবী যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের দেশ অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছে। এর থেকে আর লজ্জার কি হতে পারে? তিনি ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন রাখেন, এই পথে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছাবার যে প্রস্তুতি চলছে তাতে সাধারণ মানুষের কি কোন কল্যাণ হতে পারে?

শ্রীবসু বলেন—সারা দেশে অশিক্ষার এই অন্ধকার দূর করতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেন শুধু বিজ্ঞান নয় উচ্চশিক্ষা, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং সবই মাতৃভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক স্তরে রাজ্য সরকার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রচলনের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু সমস্যার জন্য সর্বত্র এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটাতে হলে এর বিকল্প কোন পথ খোলা নেই।

এ বছর রবীন্দ্র-পুরস্কার অর্জন করেন শ্রীশঙ্খ ঘোষ তাঁর 'ধূম লেগেছে হৃদকমলে' কাব্য গ্রন্থের জন্য। শ্রীরাম বসু পেলেন তাঁর 'একগুচ্ছ কাব্য নাট্য' বইয়ের জন্য। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক রচনার জন্য পুরস্কার পেলেন শ্রীভবানীপ্রসাদ সাহু তাঁর 'সুরা শরীর সর্বনাশা' গ্রন্থের জন্য। শ্রীতপন রায়চৌধুরী তাঁর 'ইউরোপ রিকনসিডার্ড' বইয়ের জন্য অর্জন করলেন এই পুরস্কার। অনুষ্ঠানে শ্রীতপন রায়চৌধুরী উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে অন্য সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। শ্রীরায়চৌধুরীর পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন, শ্রীমতী প্রণতি দে। মুখ্যমন্ত্রী এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন—আমরা সৃজনশীল প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানে এই ধরনের পুরস্কার দিতে পেরে আনন্দিত।

শ্রীবসু উল্লেখ করেন রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চা আমাদের চেতনা বিকাশে বিশেষ সহায়ক। কারণ তিনি ছিলেন এক মহান মানবতাবাদী কবি ও সাহিত্যিক। জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।

শ্রীবসু বলেন—শুধু সাহিত্যে নয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিভিন্ন সময় জাতীয় জীবনে যখন সংকট দেখা গিয়েছে তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ও উৎসাহিত করতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। কোন ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা তাঁকে কখনই কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের মতো মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে কমই দেখা যায়।

শ্রীবসু বলেন—রবীন্দ্রনাথের সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কেও গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি তাই দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃত্তিমূলক



রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে (বামদিক থেকে) শ্রীভবানীপ্রসাদ সাহু, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীরাম বসু, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ও তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছবিঃ ফণীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী



রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ভাষণরত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

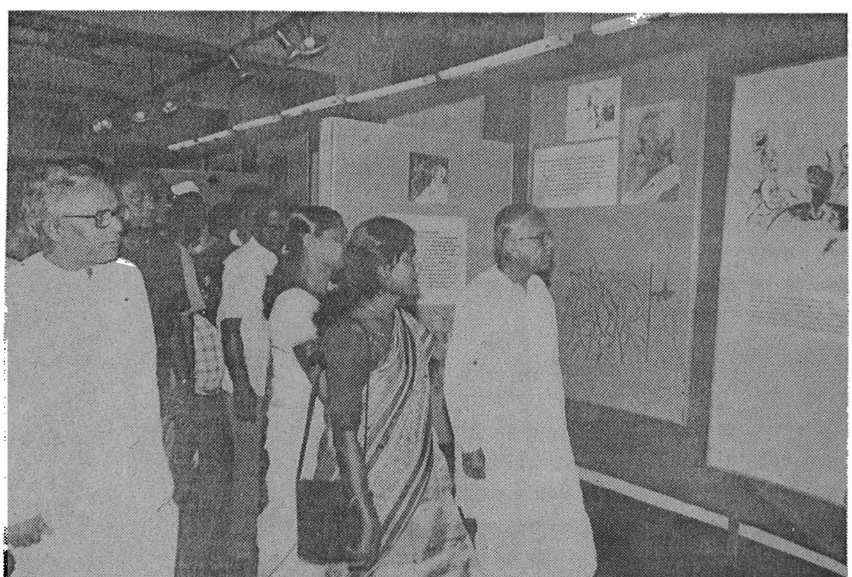
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলনের কথা উল্লেখ করেন এবং এর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

শ্রীবসু বলেন—রবীন্দ্রচর্চার কাজ সারা বছর ধরে করা প্রয়োজন। একে শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যত বেশী সচেতন হবেন আমাদের পক্ষে ততই কল্যাণ। তিনি যেসব বই পুরস্কৃত হলো—তারও ব্যাপক প্রচারে গুরুত্ব আরোপ করেন।

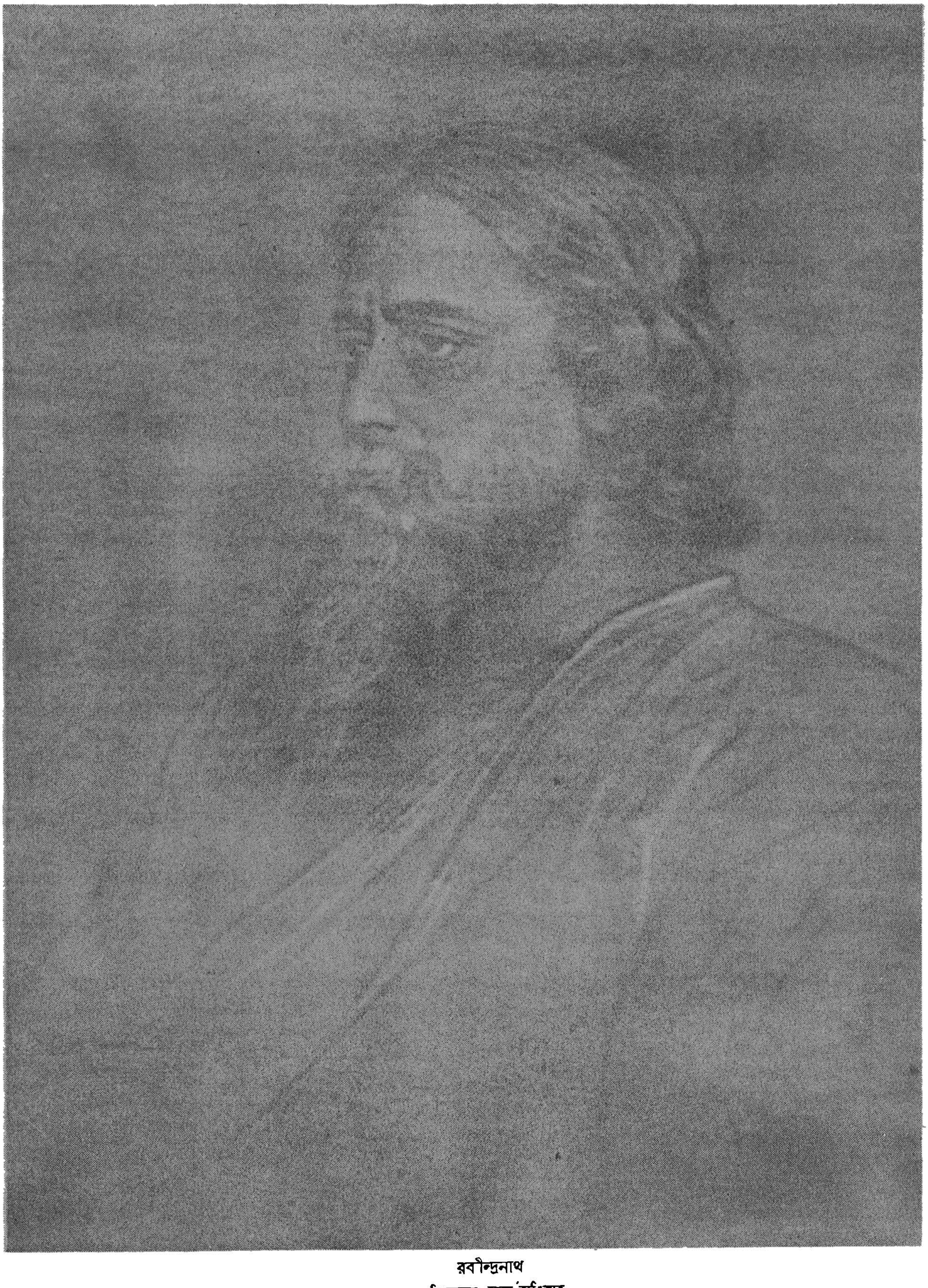
তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন—রবীন্দ্রনাথকে আমরা যথেষ্ট মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। তাই সমস্ত অপপ্রচার ও কুৎসা উপেক্ষা করে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। তিনি উল্লেখ করেন একশ্রেণীর সাহিত্যিকরা সংকীর্ণ স্বার্থে প্রচার করতেন, আমাদের সঙ্গে রবীন্দ্র-চিন্তাধারার মৌলিক বিরোধ আছে। কিন্তু এ রাজ্যের সচেতন মানুষেরা বুঝেছেন রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, যুক্তিবাদ ও সৃষ্টিকে আমরা কতখানি মর্যাদা প্রদান করি। আমাদের কাজের মধ্যেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গিয়েছে। রবীন্দ্র চর্চার এই ধারাকে তিনি অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

পুরস্কার গ্রহণ করে কবি রাম বসু বলেন—কবিতার দায় জীবনের কাছে। আমি দায়বদ্ধ কবিতায় বিশ্বাস করি। তাই এ পুরস্কার শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমার নয়—যাঁরা দায়বদ্ধ কবিতার প্রতি বিশ্বাস রাখেন—এ পুরস্কার তাঁদেরও। শ্রীভবানীপ্রসাদ সাহু বলেন, সারা দেশে আজ বিভিন্ন প্রকার নেশায় মানুষ আসক্ত হচ্ছেন—এই সমস্যা ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে। এই সমুদ্র প্রমাণ সমস্যায় আমি একটি ঢিল নিক্ষেপ করেছি মাত্র তবু এ কাজ তো আমাদের করতেই হবে। কবি শঙ্খ ঘোষ শারীরিক অসুস্থতার জন্য কোন বক্তব্য রাখতে পারেননি। সভায় উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান উচ্চ-শিক্ষা সচিব শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়।

এদিন তথ্যকেন্দ্রে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত 'বাংলার নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রদর্শনীতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন, জনশিক্ষা নীতি সম্পর্কে, সর্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষা, নারীমুক্তি ও নারী প্রসঙ্গে, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার উদ্ধৃতি ও ছবি দিয়ে প্রদর্শনীটি সমৃদ্ধ করা হয়েছে।



কলকাতার তথ্য কেন্দ্রে 'বাংলার নব জাগরণে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ও তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য



রবীন্দ্রনাথ
শশিকুমার হেস-অঙ্কিত



রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য

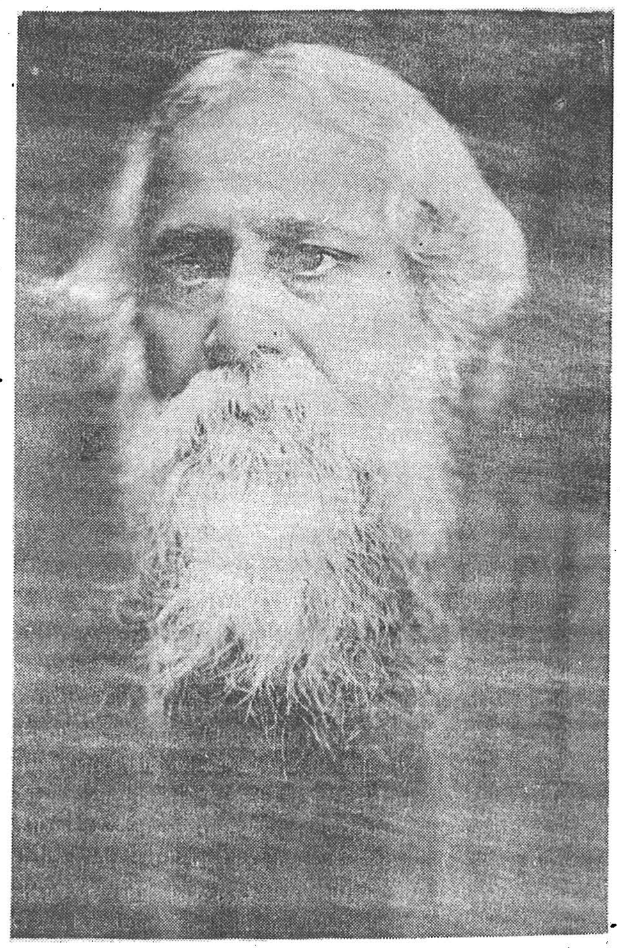
লীলা মজুমদার

কাব্য

যাঁরা ছোটদের জন্য লেখেন তাঁরা জানেন ছোটদের বইকে মোটামুটি তিন ভাগ করা যায়। এক হল নিতান্ত অপোগণ্ড অক্ষরহীন খোকাখুকুদের বই। তার বেশির ভাগই ছড়া জাতীয় এবং অনেকগুলিরই উদ্দেশ্য মজাদার ছড়ার সাহায্যে শিশুদের অক্ষর চিনিয়ে দেওয়া। দুই হল দশ–এগারো বছর অবধি ছোটদের উপভোগ্য গল্প কবিতা নাটিকা, এমন কি ছোট ছোট সরল প্রবন্ধ, যেমন ভ্রমণ কাহিনী, মজার ঘটনা, মহাপুরুষদের বিষয়ে রচনা ইত্যাদি। তিন হল বারোর ওপর যাদের বয়স, তাদের জন্য বই। এই সময়ে ছোটদের মনের অপরূপ বিকাশের সূচনা দেখা যায়। ছোটদের বইয়ের এই বিভাগটিও সবচেয়ে সমৃদ্ধ। সম্ভাবনাময় মানবশিশুর মনের উপযুক্ত রস যোগানো চাট্টিখানিক কথা নয়। সাধারণতঃ দেখা যায় অধিকাংশ ছোটদের বই-ই এই বয়সী পাঠকদের উপভোগ্য। তাই বলে তারা আরো ছোটদের বই থেকেও যথেষ্ট রস পায় এবং অনেকে বড়দের অনেক বইও উপভোগ করে।

সাধারণভাবে বলা চলে ছোটদের বইয়ের প্রধান উপজীব্যই হল সরসতা, সততা, কাল্পনিকতা। আরেকটি কথা, ছোটদের বইতে এক রকম সুকুমার পবিত্রতা থাকা উচিত, যা ঘটনার বর্ণনার থেকে অনেক বেশী জোরালো, তাই মনকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। সত্যি কথা বলতে কি প্রায় সব লোক–কথা, উপকথা, পরীদের গল্প ইত্যাদি তথাকথিত ছোটদের বইতে যেসব ঘটনার বিবরণ থাকে, সে সবই বড়দের জীবনে ঘটে এবং এমন সব মনোভাব দেখানো হয় যা শিশুজীবনের বাইরে। যেমন নর–নারীর প্রেমঘটিত হিংসা, বেদনা ইত্যাদি, নিষ্ঠুরতা, প্রতিহিংসা, লোভ। সুখের বিষয় সর্বদাই এ–সব মনোভাবের সর্বনাশা, পরিণামও দেখানো হয়। কিন্তু ঘটনা বা পরিণাম কোনোটাই শিশুজীবনে ঘটার মতো নয়। সকলেই জানেন যে শুধু তারাই শ্রেষ্ঠ ছোটদের বই লিখেছেন যাঁরা নিজেদের ছোটবেলাটিকে নিখুঁতভাবে মনে রাখতে পেরেছেন। নিখুঁতভাবে বললাম এই জন্যে যে শুধু ঘটনা মনে রাখলেই যথেষ্ঠ হয় না। ঐ ঘটনাকালে শিশুর মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তাও মনে রাখতে স্মৃতিশক্তি ছাড়া আরো কিছু সামগ্রী দরকার। উৎসাহ, আনন্দ, উপভোগ করবার আগ্রহ, দয়া, ক্ষমা। সরসতা, সততা, কাল্পনিকতা তো আছেই। এই মাপকাঠি দিয়ে যদি শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিকদের বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যায় হ্যান্স অ্যান্ডারসনের মতো কারো কারো শৈশবে দুঃখের অবধি ছিল না। সে দুঃখ তাঁদের অভিভূত করতে পারে নি। সমস্ত পৃথিবী যাঁদের চারদিকে আনন্দে নাচছে, তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত দুঃখ তুচ্ছ হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের বঞ্চিত শৈশব তাঁর সমস্ত ছোটদের জন্য লেখাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বড়লোকের বাড়ির কাঙগাল ছেলে তিনি। সে সময়কার নিষ্ঠুর নিয়মমতে চাকরদের হাতে ছিল বড়লোকের বাড়ির ছেলেদের খাওয়া-পরার ও তত্ত্বাবধানের ভার। বাইরে যাবার নিয়ম নেই।



পাঁচটা অন্য বাড়ির সমবয়সী ছেলের সঙেগ দৌড়ঝাঁপ নেই। পালোয়ানের কাছে রীতিমতো মক্স করে কবির নিজের শরীর হয়েছিল বলিষ্ঠ, কিন্তু মন হয়নি ডানপিটে। নিজেদের মধ্যে হাসি–তামাসার কথা লেখেন নি কোথাও। কারো সঙেগ রেষারেষি, গাছে চড়ে পাখির বাসা দেখা, বা ফল পেড়ে খাওয়ার কথা শুনি নি।

সেই বঞ্চিত শৈশবের কথা এমন করে পৃথিবীর আর কোনো কবি লিখেছেন বলে মনে হয় না। সে সময়ে আর তার অব্যবহিত পরেই কয়েকজন শক্তিশালী ছোটদের লেখক দেখা দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্যের মান এতটা উঁচুতে তুলে দিয়েছিলেন যে মৌলিকতায় আর সরসতায় অনেক

অগ্রসরবান দেশের সঙ্গে তার তুলনা করা যায়। সেই লেখকদের মধ্যে ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়। বাংলা শিশু-সাহিত্যের উপর এঁদের প্রভাব অনেক বেশি ও প্রকট। অথচ সাহিত্য প্রতিভায় এঁরা কেউই রবীন্দ্রনাথের ধারেকাছে পৌঁছতে পারেন নি।

এঁদের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল এক মুহূর্তের মধ্যে ছোট ছেলেকে আপনার করে নিতে পারতেন। তাদের মধ্যে তাদের ভাষায় নিজেদের পাকা বুদ্ধির রাঙা ফলগুলোকে পাচার করে দিতে পারতেন। এঁরা তাদের বন্ধুর মতো, এঁদের সঙ্গে মনের কথার আদান-প্রদান চলে। কিন্তু বিশ্বকবির পক্ষে গুরুর আসনটি ছাড়া বড় শক্ত। ছোটদের লেখকদের মানসম্মান জ্ঞান কম থাকে; তাঁরা সাধারণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাধারণ হয়ে মাটিতে বসে থাকতে পারেন। রবীন্দ্রনাথকে শৈশবে এইসব সাধারণ ছেলের সঙ্গ থেকে সযত্নে রক্ষা করে, স্বার্থান্বেষী ভৃত্যদের হেপাজতে রাখা হয়েছিল। যখন ছাড়া পেয়ে বড়দাদাদের সান্নিধ্যে যাবার অনুমতি পেলেন, ততদিনে ছেলেমানুষের মতো ছেলেমানুষি করার দিন চলে গেছে। হাত থেকে ফুল ছিনিয়ে নেবার, মাটিতে ল্যাং মেরে কাউকে ফেলবার, (চাই কি) হুটোপাটি মারপিট করবার সুযোগ চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে। সে কি কম দুঃখ!

মাস্টারমশাইদের আর দাদাদের যত্নে লিখেছেন পড়েছেন যথেষ্ট। সংস্কৃত, ইংরিজি, বাংলা, মায় কঙ্কালের সহযোগিতায় শরীরতত্ত্ব, ছবি আঁকা, গানবাজনা, ডন-বৈঠক, কুস্তী। অভিজাত পরিবারের ছেলেদের যা যা শেখা উচিত। শিখবার ব্যবস্থা ছিল না শুধু একটি জিনিষের—সে হল ছেলেমানুষি করা। কার সঙ্গে তা করবেন? দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে পেছনের সিঁড়ির রেলিংদের নিয়ে এক ক্লাস খুললেন। কড়া গুরুমশাই কাকে বলে তাঁর জানতে বাকি ছিল না।

ঐ একটি কোমল অসহায় সঙ্গীহারা ভাবুক ছেলে ছাড়া আর কোনো ছোটছেলের সঙ্গে কবির চেনাজানা ছিল না। বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা কেউ তাঁর মনের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি, তাই তাঁর লেখায় তাদের খুব বেশি দেখা পাওয়া যায় না। মা-বাবাকে পর্যন্ত সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখার নিয়ম। বাবা শাসন করলে তাঁকে বলেন রাজা। মা আদর করলে তিনি হন রাণী। এ সেই বাবা নয় যার গলা জড়িয়ে ঝোলা যায়। সে মা নয়, যার আঁচলে নোংরা পা মোছা যায়। বলছি তো ছেলেটি বড়ই বঞ্চিত।

তবে তার চোখ দুটি খোলা থাকত। তাই কবিতায় স্মৃতিকথায় বাড়ির চারিদিকটিও জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। খিড়কি পুকুরে পাড়াপড়শীরা স্নান করে যায়, রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালা ফেরি করে, মিস্ত্রিরা কাজে যায়, স্কুল ছুটি হলে ছেলেরা হো-হো করে পথের ধুলো উড়িয়ে বাড়ি ফেরে। যে ছেলেটিকে ভৃত্যরা রোজ স্কুলে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে, একলা কিছু করার যার জো নেই, মনের বাসনাগুলোকে কবিতায় মুক্তি দেওয়া ছাড়া তার আর কি উপায় আছে?

প্রকৃতির লীলাখেলায় সে ছেলে ডুবে থাকত। তারাই প্রকৃতিকে সব চাইতে ভালোবাসে, যারা প্রকৃতির বুকে লালিত। শহরে তাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কিম্বা যারা প্রকৃতির নাগাল পায় না। রবীন্দ্রনাথ বলে যে কল্পনাপ্রবণ স্পর্শকাতর ভাবুক ছেলেটিকে ছোটবেলায় একটা জানলার খড়খড়ি ফাঁক দিয়ে প্রকৃতি দেখতে হত, কিম্বা নিজেদের বাড়ির সযত্নে রক্ষিত ছোট বাগানে সাবধানে চলাফেরা করতে গিয়ে যেটুকু সম্ভব দেখাশোনা হত, সেই ভাবুক ছেলেই যে পরে 'নদী' লিখবে, 'ঝড়' লিখবে, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? সবচাইতে যার কম পরিচয়, সে ছাড়া আবার কে লিখবে প্রকৃতির উদ্দাম অসংযত তান্ডব লীলার কথা? ছোটবেলায় তাঁকে যতই ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, তিনি ততই প্রকৃতি প্রেমিকদের দলে ভিড়েছিলেন। যতই তাঁকে সেকালের স্কুল জীবনের এবং বাড়ির মাস্টারের নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা হয়েছিল, তিনি মনে মনে ততই ঘরছাড়া আগলভাঙাদের দলে গিয়ে জুটেছিলেন। ঘরছাড়াদের গুরু বলা যায় তাঁকে। মানুষের ছেলেমেয়েদের যে শহর থেকে দূরে খোলা মাঠের মধ্যিখানে বড় হতে হয়, এই বিশ্বাসের সূত্রপাত তাঁর নিজের শৈশবেই হয়েছিল।

ছোটদের জন্য কবিতা তিনি খুব বেশি লেখেন নি, অন্ততঃ তাদের উদ্দেশ্যে লেখা কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু শৈশবের বিষয়ে কবিতা তাঁর অজস্র। শৈশবের সব দুঃখ ব্যথা হতাশা ব্যাকুলতা, সব দুরাশা, সব স্বপ্ন দেখা, তিনি উজার করে দিয়েছিলেন। সে এমন গভীর কথা যে ছোটরা তার সবখানি অনুধাবন করতে পারে না। কিন্তু যদি, সব মা-বাবার, গুরুমশাইরা, অভিভাবকরা পারতেন, তাহলে আমাদের সমস্ত অসহায় অবোধ শিশুদের জীবন হত মধুময়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটিমাত্র বইকে শিশুসাহিত্য বলা হয়; তার মধ্যেও অর্ধেক হয় তো ছোটদের অনুধাবনযোগ্য নয়। এখানে বলে রাখা উচিত যে যে-সব ছেলেমেয়েরা শান্তিনিকেতনের আওতায়, কিম্বা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত পরিবারে মানুষ হয়, তারা যত সহজে এইসব শৈশবের কবিতা উপভোগ করতে শেখে, অন্যরা ততটা পারে না। আমাদের মনে হয় বাংলায় শিশুদের জন্য লিখিবার প্রতিভাসম্পন্ন কবি যদি বা দেখা যায় শৈশবের কবি আর একজনও নেই। তাঁর সারা জীবনের কর্মযজ্ঞের মর্মমূলেও ঐ বঞ্চিত শৈশব। তাতে যে সম্পূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা যায় না, একথা তিনি মর্মে-মর্মে বুঝেছিলেন। এইখানেই শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বীজ। এই বন্দীদশাতেই তাঁর মুক্তি সাধনা প্রবল হয়ে উঠেছিল।

ছোটদের কবিতার বই আলাদা করে লেখেন নি কবি। যে দুটি বইয়ের কথা প্রথমেই মনে পড়ে, সেগুলি হল 'শিশু', তার প্রথম প্রকাশ ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে, আর 'শিশু ভোলানাথ', তার প্রথম প্রকাশ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে। তবে যতদূর জানি শিশুর কবিতাগুলি সে সময়কার নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরে এক সঙ্গে করে শিশু নামে প্রকাশিত হয়েছিল। শিশু ভোলানাথের কবিতাগুলিও মৌচাক, সন্দেশ, প্রবাসী, বঙ্গবাণী, রংমশাল, শ্রেয়সী পত্রিকায় বেরিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে এই পত্রিকাগুলির অর্ধেক বড়দের পাঠ্য।

শিশুতে আছে ৬২টি কবিতা, তার হয়তো অর্ধেক বিশেষ করে ছোটদের পাঠ্য, বাকি শৈশবের বিষয়ে কবিতা হলেও এবং ছোটরা তার মানে বুঝলেও ভাব বড় বেশি গভীর। শিশু ভোলানাথের ২৭টি কবিতার মধ্যে ৯টিকে আমি শৈশবের কবিতা বলি, এগুলি ছোটদের অনুধাবন করা কঠিন। মনে হয় শৈশবের কবিতা আর শিশুপাঠ্য কবিতা আলাদা করে দুটি বই করলে, বেশি ভালো হত।

ছেলেমানুষির আসলে একটা আলাদা মেজাজ থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরুর আসনে বসে হাজার চেষ্টা করলেও, সেই মেজাজটি ধরতে পারতেন না। ছোটদের জন্য বাংলা শিশুসাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ রত্ন যিনি দান করেছেন, তাঁর বিষয়ে এমন কথা বলতে সাহস পাচ্ছি, কারণ ছোটদের কবিতাও দু'রকম মেজাজের হয়। এক হল ছোটদের বড় হওয়ার মেজাজ, আরেক হল ছোটদের ছেলেমানুষির মেজাজ। সেই মেজাজের কথা কবির ভালো করেই জানা ছিল।

আসলে ছেলেমানুষির অভ্যাস রপ্ত করার সময় তিনি কখনো পান নি। মনে হয় না যা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ডাং-গুলি, খো-খো, ফুটবল ইত্যাদি খেলার খুব বেশি সুযোগ পেয়েছিলেন। অনুরূপ বন্ধু বোধ হয় ছিল না, তাই সব কথা তাঁর কবিতার ছেলেও বাধ্য হয়ে মা-কেই বলে। সত্যিকার মা-টিকে মনের কথা বলবার সুযোগ যদি বা হত রাতে শোবার সময়, তাঁকেও হারালেন কৈশোরের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে। নিজেই বলেছেন চাকরদের শাসন থেকে ছাড়া পেয়েই ঢুকেছিলেন বড়দের রাজ্যে। সেখানে তাঁর সঙ্গীত আর কাব্য প্রতিভা প্রচুর পুষ্টি পেয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্ত ছেলেমানুষি যে ঘুচে গেছিল, তার প্রমাণ ১৫-১৬ বছরে লেখা 'ভানুসিংহের পদাবলী'। এমন প্রতিভাধর অকালপক্কতার দৃষ্টান্তের কথা ইংরেজ কবি চ্যাটার্টন ছাড়া আর শুনিনি। সত্যি কথা বলতে গেলে ঠাকুরবাড়ির ঐ অলোকসামান্য বংশধরটি জ্যাঠামিতে চ্যাটার্টনকেও ছাড়িয়েছিলেন। পরে নিজের ছোটবেলাকার সামগ্রী দিয়ে কবিতা রচনা করার সময়ে মাল-মশলা যে কম পড়বে, তাতে আশ্চর্য কি? তখন তাঁকে তাঁর হৃদয়ের সঙ্গোপনে লালিত সেই স্পর্শকাতর কোমল, সুকুমার, নির্মলচিত্ত, ভাবুক ছেলেটিকে নিয়েই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। কিন্তু সেই

ছেলের ছেলেমানুষীগুলো বাইরে প্রকাশের বেশি পথ পায় নি। এমন কি এক কাজ-ফুরনো পরিত্যক্ত পালকির দোর টেনে নীরবে নিভৃতে বসে, কত সময় তাকে কল্পনাকর্মে কাটাতে হয়েছিল। ছেলেমানুষিটুকু বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে ছিল ঠিকই, কিন্তু তার উপযুক্ত ভাষা কোথায় পাবেন ভাষার সম্রাট রবীন্দ্রনাথ?

তাই ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে 'খাপছাড়া'র কবি তাঁর বৃদ্ধ বন্ধু রাজশেখর বসুকে উৎসর্গপত্রে লিখলেন,

'যদি দেখ খোলসটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের;
যদি দেখ চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের,....।

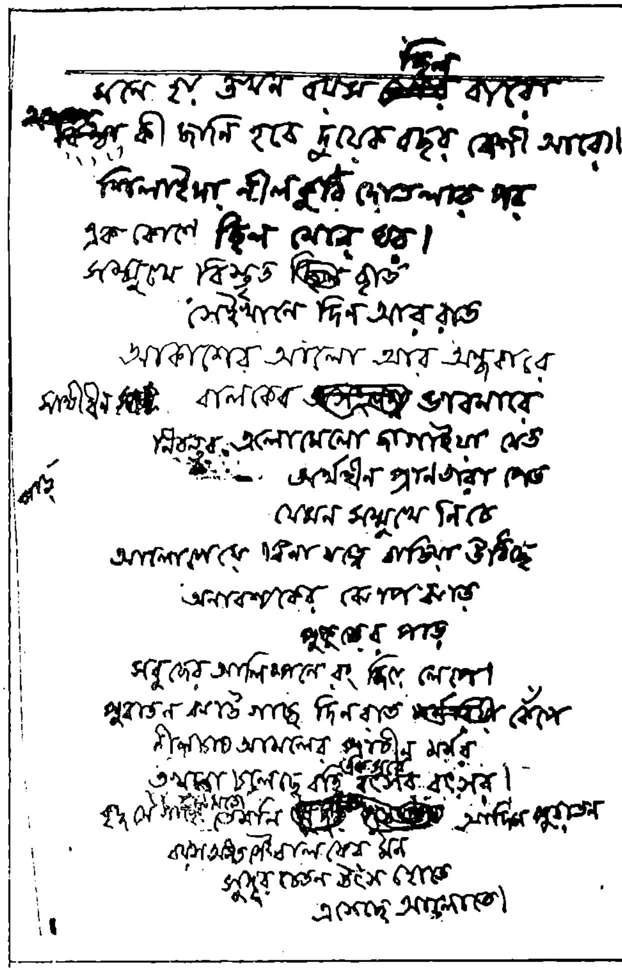
কিন্তু আমি ভাবি খাপছাড়ার একটি আজগুবি কবিতাতেও ছেলেমানুষির দেখা পাওয়া-যায় না। সারা জীবন ধরে দেখা নানা অনাছিস্টির কথা কবি এ বইতে লিখেছেন, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও ছেলেবেলার অকারণ আনন্দের কলরব শুনতে পাই না। উদ্ভট, অদ্ভুত, আজগুবি আর ছেলেমানুষি এক নয়। ছেলেমানুষিতে একরকম উচ্ছ্বসিত আনন্দ থাকে, বেঁচে থাকার সুখ থাকে, অকারণ পুলকে সবাই নাচে গায়। খাপছাড়ায় তাকে পাই না। তাই খাপছাড়া ছোটদের জন্যে নয়, এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ছেলেমানুষদের সেই অযৌক্তিক উৎসাহ পোড়-খাওয়া বুড়ো কবি কোথায় পাবেন? কম পোড় তো খান নি। বিধাতা তাঁর পার্থিব সংসারকে ছিন্নভিন্ন করে তবে ছেড়েছিলেন। সেই ভস্মস্তূপের বুক থেকে যে স্বর্গীয় আগুন জ্বলেছিল, তাই দিয়েই বিধাতা তাঁর কৃপা-দৃষ্টি-পাওয়া এই সন্তানটিকে কবি করে দিয়েছিলেন। সে এমন কবি, যার জুড়ি খুঁজতে দেশ-কাল পরাজিত হয়। কিন্তু তার মধ্যে ছেলেমানুষি কি করে পাব?

যেমন নিখুঁত মিলের ঘটা, তেমনি রসের ছড়াছড়ি। এবং তেমনি দেখা যায়, ধ্রুব সত্য, সকলের ঘরে ঘরে। তবে ছেলেমানুষি নয়। কবি নিজেও এ বইকে ছেলেমানুষদের বই বলেন নি। উৎসর্গ করেছেন আরেক বুড়োকে। আমরাই জোর করে ছোটদের বইয়ের তালিকায় এই বইয়ের নামও গুঁজে দিই। রসরাজ ছিলেন কবি, তিনি কেন অপাত্রে রস পরিবেষণ করতে যাবেন? এই আজগুবি বই নিশ্চয় বুড়োদের জন্যেই লেখা।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটদের কবিতা সংগ্রহ করতে গেলে 'শিশু' আর 'শিশু ভোলানাথ' থেকেই অনেকগুলি নিতে হবে। ঐ দুটি বইতেই কবির সব চাইতে মধুর ছোটদের কবিতা পাওয়া যাবে। খুব ছোটদের জন্যে নয় সে-সব। বরং প্রথম শৈশব শেষ করে যারা কৈশোরের দিকে এগিয়ে চলেছে, এ-সব কবিতা তাদের জন্য। খুব ছোটদের জন্যে খুব বেশি কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর নিজের শৈশবে যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর ইত্যাদি সবে হাঁটতে শিখেছিলেন, বাংলা 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী' যা আমাদের শৈশবকে মধুর করে রেখেছিল, সে তখনো সম্ভাবনার কোঠায়ও স্থান পায় নি। তবে 'সহজপাঠের প্রথমও দ্বিতীয় ভাগে' সবে যাদের অক্ষর পরিচয় হয়েছে, যুক্তাক্ষর সব চেনা হয় নি, তাদের জন্য যে-সমস্ত অপূর্ব কবিতা দেখি, তার তুলনা হয় না। যুক্তাক্ষর সেখানে অবান্তর, মানে সেখানে প্রকট, ছবি সেখানে উজ্জ্বল। দু'-একটার কথা মনে করিয়ে দিই।

"আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।"

মনে পড়ামাত্র সেই আমাদের না-দেখা বাপ-পিতেমোর গাঁ খানি চোখের সামনে রূপ নেয়, যদিও পৃথিবীর কোনো মাটিতে তার প্রতিষ্ঠা নাও হয়ে থাকতে পারে। আরেকটি বলি—

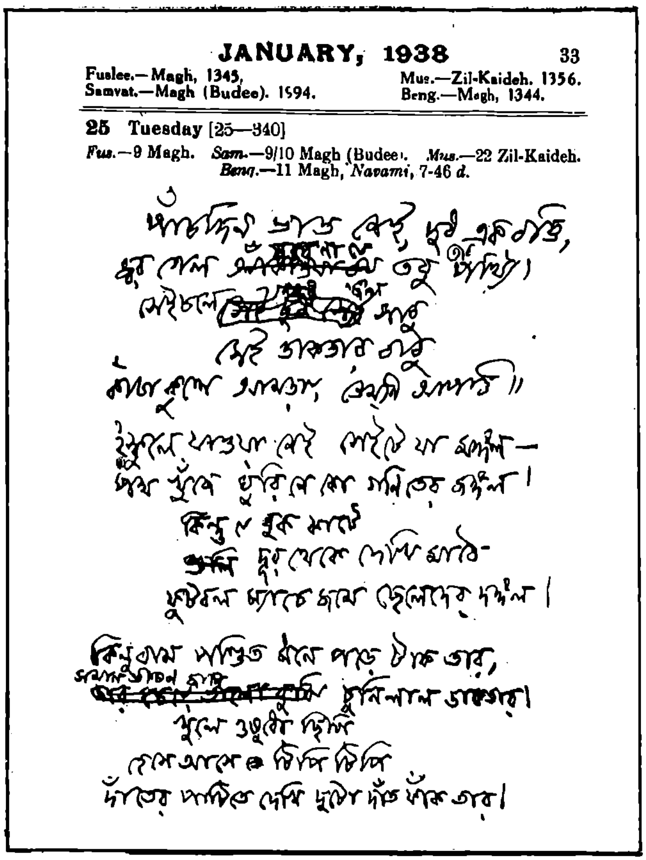


"কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি
বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি।
গাড়ি চালায় বংশীবদন,
সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন।
হাট বসেছে শুক্রবারে
বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে,
জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে .
গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।"

কেমন মিষ্টি করে কবি হাতে হাতে জোড়া অক্ষরগুলো ধরিয়ে দিচ্ছেন। আসল কথা হল যে সব বুড়োদের সহজপাঠ পড়া উচিত। তাজা রস, খাঁটি রস কাকে বলে জানা হয়ে যাবে।

আমি এই প্রসঙ্গে কিশোর-উপভোগ্য যে কবিতাগুলির কথা বলছিলাম, সেগুলি ভাষায়, ভাবে, কাব্যগুণে যে-কোনো দেশের সেরা কবিতার সমান এবং মাঝে মাঝে ছাড়িয়েও যায়। যেমন 'শিশু'র 'সমব্যথী' কবিতাটি। কিম্বা 'রাজার বাড়ি' কবিতাটি।

ভাবুক ছেলের মনের কথা জানতে কবির এতটুকু বাকি ছিল না। আশ্চর্য লাগে ভেবে যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তো ছোট মেয়ের অভাব ছিল না, একসঙ্গে খেলাও হত নিশ্চয়। তবু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছোট মেয়ের দেখা পাওয়া যায়। ঐ যে ছোট খুকি, যে ছিল বড্ড ছেলেমানুষ, গণেশকে বলত গানুশ, আর যাকে তারা ভাবত, সে আসলে ফানুস! ঐ যে বোকা মেয়েটা যে খেলাঘরের মাটির ভাত মুখে পুরত আর মুখে কাপড় জড়িয়ে জুজুবুড়ি সাজলে ভয়ে চেঁচাত, তাকে মানুষের মধ্যেই ধরা যায় না! কিন্তু গেরস্তর ঘরের এইসব নাটিকা কবির চোখ কোনো সময়ই এড়িয়ে যেত না।



JANUARY, 1938 33

Fuslee.—Magh, 1345. Mus.—Zil-Kaideh. 1356.
Samvat.—Magh (Budee). 1594. Beng.—Magh, 1344.

25 Tuesday [25—340]

Fus.—9 Magh. *Sam.*—9/10 Magh (Budee). *Mus.*—22 Zil-Kaideh.
Beng.—11 Magh, *Navami*, 7-46 *d.*

বলেছি তো শৈশব সম্বন্ধে কিছু তাঁর জানতে বাকি ছিল না। যে-সব পরিবেশের কথা লিখেছেন, সে সব হল আমাদের দেশের বড় চেনা পাড়াগাঁ। সেখানকার গেরস্তবাড়ির বাবারা বিদেশে চাকরি করে, মাঝে-মধ্যে আসে, মা-রা রাঁধাবাড়া ঘরকন্না করে আর ছোট ছেলের চিরসঙ্গী হয়ে থাকে। খালি ঐ বিশেষ ছেলেটাই একটু কেমন যেন। যাকে বলে অসাধারণ। বড় বেশি ভাবুক। কতটুকু দেখে আর কতখানি ভাবে, মনে করলে অবাক হতে হয়। হাতের নাগালের মধ্যে যা আসে, তার চেয়ে অনেকটা বেশি পর্যন্ত তার মনের আনাগোনা। ঐখানেই কবিত্বের কুঁড়ি।

'পথহারা' কবিতার ঐসব ভয়ের বিষয়ে সেই ছেলের ভালো করেই জানবার কথা, যাকে রাতে পড়া সেরে জোড়াসাঁকোর বাড়ির একতলার আধা অন্ধকার গলি দিয়ে একলা শুতে যেতে হত! সেই সঙ্গে, বিশ্বের সমস্ত নিঃসঙ্গ ছেলের কল্পনাপ্রবণ মনের ভয়-ভাবনা পুঞ্জীভূত হয়ে এই কবিতায় স্থান পেয়েছে। আবার সেই ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সহজ উপায়ও আছে। পুরনো পাল্কিতে বসে যে-সব ডাকাতের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল, পাল্কির দরজা টেনে বন্ধ করে দিলেই সে বিপদের নিষ্পত্তি হয়েছিল। এবারো তাই। ভাবুক ছেলের কাল্পনিক বিপদের ঐ এক মস্ত সুবিধা।

আরেকটি উপায়ও আছে। বারো বছরে যে ছেলে মা-হারা, তার সে উপায়টি অজানা নয়। কোনোমতে মায়ের কাছে পৌঁছলেই হল। পৃথিবীর চিন্তাজগতের আর কোনো ভয়-ভীতি তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যখন শিশু ভোলানাথের 'তালগাছ' কবিতা লেখা হয়েছিল, সে ছিল ১৩২৮ সাল। কবির বয়স তখন ষাটের কাছাকাছি, মনে হয় কবিতাটিতে শুধু ছোট ছেলের চিন্তার কথা নেই, পরিণত বয়সের মনের ছাপও পড়েছে। তবু কোনো ছোট ছেলের এ কবিতার মানে বুঝতে অসুবিধা হয় না। এ রকম অসংখ্য কবিতা আছে, যা কতক ছোট ছেলের চিন্তা দিয়ে গড়া, কতক ঐ ছোট ছেলের স্নেহময় গুরুর মনের কথা। ছোট ছেলে মানুষ করতে হলে শহরের বাইরে, প্রকৃতির স্বাধীন পরিবেশে ফিরে যেতে হবে, এ-কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। আর শুধু তাই নয়, নিজের জীবনের সমস্ত সংগতি ও কর্মক্ষমতা তিনি ঐ কাজেই নিবেদন করেছিলেন। তাই গোড়াতেই বলেছি তাঁর কিছু কবিতা শিশুদের জন্য আর কিছু হল শৈশবের বিষয়ে। শেষেরগুলি বড়রা অনুধাবন করলে শিশুর জীবন অনেক সুখের হতে পারে।

"তালগাছে' শ্রেণীর 'স্কাইলার্কের' সঙ্গে সাদৃশ্য দেখি। ঐ কবিতাটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। তিনি বলতেন যে, সব কিছু বড় বেশি সহজ করে ছোটদের দিলে তাদের মনের প্রসার হবে কি করে? ব্রাউনিং যেমন বলেছিলেন—'A man's reach should exceed his grasp, or what's a Heaven far?' এ-কথা কবির মতে ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারেও খাটে। অর্থাৎ যতটা আয়ত্ত হয় তার কিছু বেশির দিকে হাত বাড়াতে হয়, নইলে স্বর্গে কি বা প্রয়োজন? ভিক্টোরীয় যুগের এই সুন্দর আদর্শটি ভুলে গেলে আমাদেরই ক্ষতি। রবীন্দ্রনাথ ভোলেন নি। ১৯৩১-এ তাঁকে ১২।১৩ বছরের বাঙালী ছেলেমেয়েদের শ্রেণীর স্কাইলার্ক পড়াতে শুনেছিলাম। মনে হয়েছিল আকাশ থেকে স্কাইলার্কটিকে ধরে যেন ছেলেমেয়েদের কোলে দিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিশু-বিষয়ক কোনো কোনো কবিতাকে অনেকে বড় বেশি শক্ত বলেন। কিন্তু আমার অনেকবার মনে হয়েছে ১৪।১৫ বছরের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির বাইরে খুব কম চিন্তাই আছে। ভাষাও সব সময় যে খুব কঠিন তাও নয়। তবে চিন্তা এতই গভীর যে ভাষার মধ্যে ধরা পড়ে না। ঠিক মনে হয় ভাষার নিচে যে উপলব্ধির গভীরতর স্তর আছে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাগুলি থিতিয়ে গিয়ে সেইখানে জমা হয়। তখন ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে তার সবখানি মানে না বুঝলেও, ওপরের ভুবনেও যথেষ্ট বাকি থাকে। তারপরে

"হাওয়া যেই থেমে যায়, পাতা-কাঁপা থেমে যায়, ফেরে তার মনটি—
যেই ভাবে মা যে হয় মাটি তার, ভালো লাগে আরবার পৃথিবীর কোণটি।"

এ যেন সেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চিরন্তন সত্য—"True to the kindred points of heaven and home." মায়ের কাছে ফেরার আরাম সব সুখী ছেলেও জানে, দুঃখীরাও জানে।

এই সংসার-ভাঙা কবির কাছে HOME-এর ছিল অপরিসীম মূল্য। ঐ Home-এর মহান রূপ হল দেশ। এমন দেশপ্রেমিক কবি আর কোথায় আছে? আজকালকার লোকে দেশকে ভালোবাসতে ভুলে গেছে। তারা পড়ুক কবির "কথা ও কাহিনী", পড়ুক "নৈবেদ্য"। নৈবেদ্য কোনো পাঠকের কথা ভেবে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু তার বহু কবিতাই কিশোর পাঠ্য। আর "কথা ও কাহিনী" কিশোরদের জন্য লেখা। এ-কথা আমি বিশ্বাস করি। দেশকে ভালোবাসতে হলে, ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসতে হয়। শুধু রূপ-গুণের জন্য এ ভালোবাসা নয়। মায়ের রূপ-গুণের জন্য কেউ মা-কে ভালোবাসে না, নাড়ির টানে ভালোবাসে। মুখ্যু, কদাকার মা হলেও, তাকে ছেলে ভালোবাসে। দেশের বেলাও তাই। যে দেশের জল-মাটি-হাওয়া দিয়ে দেশের সন্তানরা যুগ যুগ পুষ্ট হয়েছে, সে হল সন্তানদের সব মায়ের পরম মা। এ-কথা শিখতে হবে শৈশবে। পরে আর হয় না। স্বার্থ এসে বাধা দেয়। এ-কথা কবি জানতেন।

নৈবেদ্যের অনেক কবিতায় এই দেশপ্রেমের কথা পাই। শুধু দেশের সম্পদ নিয়ে গর্বে নয়, দেশের দুঃখ-দুর্বলতা নিয়ে বেদনায়, নিজেদের ভ্রান্তি থেকে মুক্তির প্রার্থনায়।

এ-সব কবিতাই গুরু শিক্ষা দিচ্ছেন ছাত্রকে। বলেছি তো কবি হলেও গুরুর আসন ছাড়েন নি তিনি। যেসব আদর্শ তিনি ধরে দিচ্ছেন ছাত্রের সামনে, সে সব হল মনুষ্যত্বের আদর্শ, মানবিকতার শিক্ষা। বারো-তেরো বছরের ছেলেমেয়েদের না বুঝবার কিছু নেই এতে। তবে ভাষাটি হয়তো একটু কঠিন, একবার পড়লেই হয়তো মানেটা প্রকট হয় না। হয়তো আনন্দের কথা নেই এতে। খেলার সময়কার কবিতা নয় এগুলি। কিন্তু সব কবিতাই কি খেলার কবিতা হওয়া চাই? মানুষ হবার কিছু শিক্ষাও দরকার। এমন সুন্দর করে সে শিক্ষা কবি ছাড়া কে দেবে?

নৈবেদ্য বইখানি রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালে তাঁর বাবাকে উৎসর্গ করেছিলেন। নানারকম কবিতা আছে এতে। তার খানকতক মনে হয় বিশেষ করে ছোটদের উপযুক্ত। সবগুলিই মঙ্গলের জয়গান। অবিশ্যি মানে বুঝতে পারলেই কোনো রচনা ছোটদের উপযুক্ত হয়ে যায় না। ভাবের দিকটাও আছে। এমন কি ছোটরা উপভোগ করলেই কোনো রচনাকে ছোটদের জন্যে লেখা মনে করলে হবে না। কবির দু'-হাজার গানের প্রায় সবগুলি এবং প্রায় সব নাটকের অর্থ ১২ থেকে ১৬ বছরের ছেলে-মেয়েরা বুঝতে পারে। এবং বেশির ভাগকেই উপভোগও করে। তবু সেগুলিকে শিশুসাহিত্য বলা যায় না। বড়োদের জীবনেরও অনেকখানি ছোটরা দেখে, বোঝে, হয়তো বেদনা পায়, কিম্বা মজা পায়। তবু সেগুলি ছোটদের জীবন থেকে আলাদা।

মাঝে মাঝে অভিযোগ শুনি রবীন্দ্রনাথের ছোটদের রচনারো মানে বড় শক্ত। তার আরেকটি কারণ হল এগুলি যে সময়ে লেখা হয়েছিল তখনো সাহিত্যে কথিত ভাষার চল হয় নি।

এবার সব দিক দিয়ে ছোটদের উপযুক্ত দু'খানি বইয়ের কথা বলি। পরে দু'টিকে একসঙ্গে 'কথা ও কাহিনী' বলে আমরা জানি।

'কথা' বইটি ১৩০৬ সালে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। সূচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা উদ্ধৃত করি। তিনি লিখেছিলেনঃ—

"একদিন এল যখন আরেকটা ধারা, বন্যার মতো মনের মধ্যে নামল। .... ইংরেজি অলংকার শাস্ত্রে এই শ্রেণীর ধারাকে বলে Narrative। অর্থাৎ কাহিনী। এর আনন্দবেগ যেন থামতে চাইল না। .....

এসব লেখার ভালোমন্দ বিচার করা অনাবশ্যক, চিন্তার বিষয় এর মনস্তত্ত্ব। ..... ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে 'কথা'র কবিতাগুলিকে narrative শ্রেণীতে গণ্য করলেও, তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা একেকটি খন্ড দৃশ্য... এই সন্ধানে এক সময় গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে। .... এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে, যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।"

এই তো গেল কথার অতুলনীয় কবিতাগুলি সম্বন্ধে রচয়িতার মন্তব্য। তার চেয়েও আরো বেশি আছে। কবিতাগুলির মূলে একেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও, প্রত্যেকটি একটি নিটোল শিল্পকর্ম। তাতে রূপ, রস, ভাব কিছুর অভাব নেই। তার উপরে নীতিশিক্ষা। নীতিশিক্ষা খুব মন্দ জিনিস নয়। বিশেষ করে সে যদি সরস হয়, সুন্দর হয়, এই কবিতাগুলির মতো। ইতিহাসের মতো প্রত্যক্ষ নীতিশিক্ষা আর কোথায় পাওয়া যাবে? 'কথা'র ঘটনাগুলি কবি-কপোলপ্রসূত নয়, প্রত্যেকটির মূল কোথায়, তার নির্দেশ দেওয়া আছে। কিশোর বয়স্কদের জন্য এমন সার্থক সুখপাঠ্য কাব্যগ্রন্থের কথা মনে পড়ে না। প্রত্যেকটি কবিতা নিজগুণে বিখ্যাত হয়ে আছে। যেমন ভাবে, তেমনি ভাষায়। শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, ব্রাহ্মণ, পূজারিণী, অভিসার, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্যপ্রাপ্তি, অপমান বর, স্পর্শমণি, বন্দীবীর, মানী, প্রার্থনাতীত দান, রাজবিচার, গুরুগোবিন্দ, শেষ শিক্ষা, নকল গড়, হোরি খেলা, বিচারক, পণরক্ষা—একেকটি কবিতা শুধু ইতিহাসের ঘটনা নয়, মনুষ্যত্বের পাঠ। এ-সব গুণই হল দেশ-প্রেমের উপাদানের অন্যতম।

'কাহিনী'র কবিতাগুলি মৌলিক ও কবি-কল্পিত। 'কথা'য় যদি মনুষ্যত্বের পাঠ পাওয়া যায়, তবে 'কাহিনী'তে পাই মানবিকতার পরিচয়। কবিতাগুলিও সেইরকমই সর্বজনপ্রিয়। গানভঙ্গ, পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, দেবতার গ্রাস, বিসর্জন—আর কোনো কবি এমন প্রচন্ড প্রবল অথচ মধুরভাবে মানুষ হবার নিয়ম শিখিয়েছেন বলে জানি না। নিজেদের মনের ক্ষুদ্রতা দুর্বলতা, অনুদারতা, নিষ্ঠুরতা যেন নিজেদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মানবিকতার আর মনুষ্যত্বের আদর না জানলে, দেশকে ভালোবাসা যায় না। কবি বারে বারে ঐ ভালোবাসার পাঠ দিয়েছেন।

১৬ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের পাঠ্যকে আমরা শিশু-সাহিত্যের মধ্যে ধরেছি। সেই নিয়মে 'কণিকা'কেও ছোটদের পাঠ্য বলা যায়। ছোট ছোট ছড়া, বুদ্ধিদীপ্ত, সরস; শিশিরের ফোঁটায় রোদ পড়লে যেমন ঝলক দেয়, তেমনি উজ্জ্বল। 'কণিকা'কে আমি শিশুপাঠ্য বলেছি, কারণ তার মর্ম আর রস দুই-ই কিশোর বয়স্করা উপভোগ করতে পারে। পরে তার আরো গভীর অর্থ খুঁজে পেলেও, ঐ বয়সের উপযোগিতা কিছু কমে যায় না।

'কণিকা'র ঐসব কথা কৈশোরে শুনলে, সারা জীবনের অবলম্বন পাওয়া যায়। শিক্ষামূলক সাবধানী কথা দিয়ে হয় তো শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয় না। সূর্যের আলোর মতো, বৃষ্টির ধারার মতো, যে-কারণেই তারা আকাশ থেকে নেমে আসুক না কেন তাদের ফল হয় মঙ্গল। পৃথিবী সবুজ শ্যামল হবে বলে কি আর বৃষ্টি নামে, আলো ফোটে? তার আলাদা কারণ আছে, কিন্তু ফল বড় মধুর। তাই 'কণিকা'র প্রায় সব ছড়াকেই আমি কিশোরপাঠ্য বলি।

খানকতক বইয়ের নাম করলাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আরো বহু শিশুপাঠ্য কবিতা নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাদের সম্পূর্ণ তালিকা আমার সাধ্যের বাইরে। তাছাড়া সেটি আমার উদ্দেশ্যও নয়। এত কথা বললাম ঐ যে একটি অভিযোগ শুনি রবীন্দ্রনাথ ছোটদের কবি নন, তার প্রতিবাদে। তবে এ-ও মনে হয়, খুব ছোটদের জন্যে তিনি নন। যে তার নিজের প্রথম শৈশব খুব বেশি উপভোগ করে নি, সে কি করে শৈশবের উদ্দাম অর্থহীন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের কথা লিখবে? এত হাজার হাজার কবিতার মধ্যে সাধারণ বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা যেসব অকারণ পুলকে দিন কাটায়, কবি তার বেশি উল্লেখ করেন নি। ঐ যে মাঠে-ঘাটে ছুটে বেড়ানোর স্বাধীনতা তিনি নিজে পান নি। তার না-পাওয়ার বেদনার দিকটা বুঝলেও, পাবার মজাটুকু জানেন না। জানলা দিয়ে তাকিয়ে মা-কে কি বলছে? না, তার ইচ্ছা করে সে রোজ সকাল হলে তমিজ মিঞার গরুর গাড়ি চড়ে, (মনে মনে) শহরে গিয়ে বাড়ি তৈরী করে! সে ছেলে ফূর্তি কাকে বলে, তা-ই জানে না। কবি তার কোনো উদ্দাম খেলার, কোনো পারিবারিক আনন্দোৎসবের বর্ণনা কোথাও দেন নি। এ কেমন ধারা ছেলে যে বন্ধুদের সঙ্গে মাছ ধরতে যায় না; চাড়িভাতি করে না; মিছিমিছি চ্যাঁচায় না; কাউকে বোকা বানায় না; ভূতের ভয় দেখায় না? যদি বা কখনো আনন্দোৎসবের কথা বলেছেন, তার করুণ পরিণাম শুনে কান্না পায়। যাকে বলে ছোটবেলার মেজাজ, নিছক বেঁচে থাকার আনন্দ, তাকে খুঁজে পাই না।

অথচ রসবোধ ছিল অপর্যাপ্ত, কাব্যে তাকে অবাধে উৎসারিত করার পথে বোধ হয় একটা বাধা বোধ করতেন। 'বাল্মীকি প্রতিভার' দস্যুদের কুকীর্তির সময়কার তান্ডব আনন্দের সঙ্গে এর তুলনা করা যায় না। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকাটি কিশোর বয়স্কদের জন্য রচিত, অতি সুরসিকভাবে পরিকল্পিত, অত্যন্ত মজার সংলাপ ও কিছু কিছু পরিস্থিতি। কিন্তু সব কিছুর পিছনে ক্ষীরোঝির নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে উচিত শিক্ষা দেবার একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকাতে গল্পে কোনো সুকুমার ভাব ফুটতে পারে নি। মজার হলেও, বয়স্ক জীবনের নিষ্ঠুর আচরণের তিরস্কার বলে সমস্ত নাটকটিকে প্রত্যয় হয়।





রবীন্দ্রনাথ। ১৮৭৭
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত

গদ্যরচনা আর নাটক

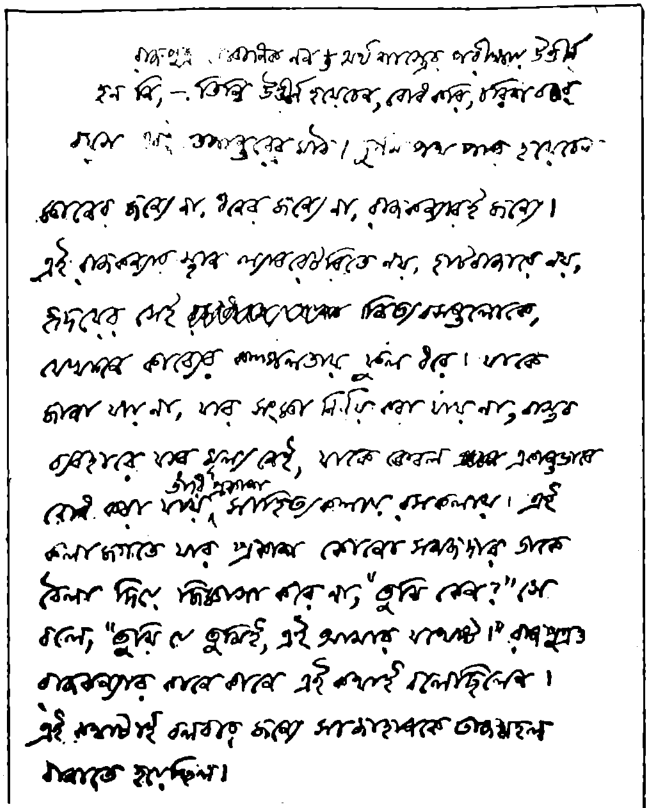
নানা জনে সাহিত্য রচনা করে নানাভাবে, নানান্‌ মেজাজে। কেউ কেউ বা ছোটদের জন্য লেখে তাদের বড় হতে শেখাবার চেষ্টায়। আবার কেউ বা লেখে যাতে তাদের ছোটবেলাটি এত উপভোগ্য হয়ে যায় যে তার মধ্যে থেকেই বড় হবার খানিকটা পাথেয় পাওয়া যায়। কেউ বা ছোটদের গুরুমশাই, কেউ বা তাদের খেলার সাথী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঐ প্রথম দলের; সুকুমার রায় দ্বিতীয় দলের একজন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার সময়েও একথা বলা হয়েছে। তাঁর গদ্য রচনায় ব্যাপারটা আরো প্রকট হয়ে ওঠে।

তিনি যে অন্তরে অন্তরে কবি ছিলেন, এ-কথা তাঁর কাব্য থেকেও যেমন, তেমনি তাঁর বহু গদ্য রচনার ভাষা ও ভাব থেকেও বোঝা যায়। তিনি আকাশচারী আদর্শবাদী কবি হলেও ভারি কেজো মানুষও ছিলেন। এই দু'টি গুণ যে পরস্পর-বিরোধী নয়, তাঁর জীবনী পর্যবেক্ষণ করলে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী কেজো মানুষ না হলে, অল্প অর্থ-সংগতি আর বেশি মতবিরোধ সত্ত্বেও, বিশ্বভারতীর মতো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারতেন না। আজ পর্যন্ত বিদেশের লোকরা তাঁর শিক্ষাদর্শের আদর করে, কিন্তু তারা অনেকেই ভুলে গেছে তিনি কত বড় কবি ছিলেন। তাঁর কাব্য যেমন সূর্যের আলোর মতো চারিদিককে উদ্ভাসিত করে দেয়, তেমনি তাঁর গদ্য রচনা জ্ঞান-বুদ্ধির আলোতে জীবনযাত্রার কোণগুলো থেকে সব অজ্ঞানতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, মূর্খতা দূর করার প্রয়াস করে।

মুশ্‌কিল হল বিশেষ করে ছোটদের উদ্দেশে রচনায়। নিজে ছিলেন অসাধারণ রকমের ভাবুক ও মেধাবী ছেলে, কাজেই মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ ছেলেমেয়েদের জ্ঞান-বুদ্ধির দৌড়টার ঠিক মাপ সবসময় পেতেন বলে মনে হয় না। তাঁর গদ্য রচনা পড়লে এ-কথাই বারবার মনে হয়।

অন্য প্রমাণও আছে। কোনো কোনো প্রাচীন প্রাক্তন ছাত্রের কাছে শুনেছি যে সেকালে বুধবারে বুধবারে সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হত। কবি তখন সমবেত ছাত্রদের যে-সমস্ত অমূল্য উপদেশ দিতেন, তাই দিয়ে 'শান্তিনিকেতন' নামক অদ্বিতীয় ধর্মগ্রন্থ রচিত হলেও, অকুস্থলে গুরুর সুকুমার শ্রোতারা সে-সমস্ত শুনতে শুনতে যে যার নিজের জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ত। কেজো গুরু তখন তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখবার এক অব্যর্থ উপায় ঠাওরালেন। নিয়ম হয়ে গেল যে উপদেশের সময়ে সকলকে উঠে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তাতে সম্ভবতঃ ঘুমের ব্যাঘাত হত, কিন্তু গুরুগম্ভীর ভাষণগুলোর প্রাঞ্জলতা একটুও বাড়ত কি না সন্দেহ। তাই ঐ সব অপূর্ব ভাব-ভাষা সম্বলিত ভাষণগুলিকে শিশুপাঠ্য রচনার তালিকা থেকে বাদ দিতে হল।

সহজ ভাষা যে তিনি লিখতে পারতেন না, তা বললে চলবে না। অতিশয় সহজ ভাষায় লেখা তাঁর অনেক রচনা দেখি। আবার তার মধ্যেও ভাবের বড় বেশি গভীরতাও চোখে পড়ে। তাঁর নাতনিদের, কিম্বা নাবালিকা ভক্ত শ্রীমতী রাণু অধিকারীকে লেখা চিঠিপত্রগুলির নিতান্ত ব্যক্তিগত রূপ নেওয়াই স্বাভাবিক হত। কিন্তু কবি তো আর সে অর্থে সাধারণ ও স্বাভাবিক ছিলেন না, কাজেই পড়তে পড়তে অনেক সময় মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের মতো অপার্থিব প্রতিভাধররা যত কেজো মানুষই হন না কেন, তাঁদের সব চিন্তায়, সব কর্মে, কেমন একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব বিরাজ করে। যখন তাঁরা লেখেন, তখন অন্তর থেকে উচ্ছ্বসিত কথাগুলি যে কাকে বলা হচ্ছে, কেন বলা হচ্ছে, এসব তুচ্ছ চিন্তা মনে স্থান পায় না। ভারি সরস ঐ চিঠিগুলি। খানিকটা রোজনামচা, খানিকটা ভ্রমণ কাহিনী, খানিকটা রসিকতা। ভারি উপভোগ্য। তারি মধ্যে এখানে-ওখানে দেখি শান্তিনিকেতনের মন্দিরে নিজের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার। মনে হয় নাতনিদের কাছে লেখা চিঠিপত্র আর শ্রীমতী রাণুকে লেখা 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' সব বাঙালী ছেলে-মেয়েদের পড়া উচিত। সহজ ভাষা নদীর স্রোতের মতো ছুটে চলে। রসে টৈটম্বুর। শান্তিনিকেতনে কবির প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার ছবি ফুটে ওঠে। কত না মজার কথা, মেলার



বর্ণনা। ভ্রমণকাহিনীগুলিও ভারি উপভোগ্য। মাঝে মাঝে কাদায় পতন, গাড়ি বিগড়ানি ইত্যাদি নানা বিভ্রাট নিয়ে কত রসিকতা। নিজেকে নিয়ে মজার সব মন্তব্য। নাকি তিনি বড় ভালো বাক্স গুছোতে পারেন। সব দরকারি জিনিস বাড়িতে ফেলে রেখে, অদরকারি জিনিস দিয়ে বাক্স বোঝাই করেন। তার মস্ত সুবিধা হল যে বাক্স ঘাঁটা-ঘাঁটি করবার দরকার হয় না, হারিয়ে গেলেও অসুবিধা নেই। যাদের রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁদের খুব বেশি আর বাকি নেই। তাঁরা সবাই জানেন মানুষটি যেমনি গম্ভীর, তেমনি আমুদে ছিলেন। এই চিঠিগুলিতে এই আপাত পরস্পরবিরোধী গুণ দু'টিকে বড়ই সুন্দরভাবে এক আধারে দেখতে পাওয়া যায়।

গল্পের কথাই প্রথমে বলি। গল্পগুচ্ছের বেশ কিছু গল্প পড়েও ছোটরা অনেকখানি রস ও শিক্ষা পেতে পারে। কিন্তু সমস্ত পরিবেশনার দিকটাই বড়দের জন্য। রবীন্দ্রনাথ এসব গল্প বড়দের জন্যেই লিখেছিলেন। ছোটদের গল্প বলতে বাকি থাকে 'মুকুট', তার নাট্যরূপও হয়েছে। হিংসা, রেষারেষি, দ্বেষ, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছার মধ্যে কোনো সুকুমার গুণ না থাকলেও, যে নীতিশিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন কবি, ছোটরা সেটি ভালো করেই উপলব্ধি করে। কারণ রাজা-রাজড়ার কথা বাদ দিয়ে, তাদের নিজেদের ছোট জীবনেও তাদের ঐ সব রিপুর সম্মুখীন হতে হয়। অবিশ্যি যে বলিষ্ঠ আনন্দকে আমরা শিশুসাহিত্যে খুঁজি, এ গল্পে তাকে পাওয়া সম্ভব নয়। দু'টি মহৎ প্রাণের বলিদান দিয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে।

আর আছে 'সে' এবং 'গল্পসল্প'। যতই মন খুঁৎখুঁৎ করুক, ও দু'টিকে কোনোমতেই বড়দের পাঠ্য বলা চলে না। সার্থক ছোটদের বই বলতে সবার আগে মনে পড়ে 'ছেলেবেলা'র কথা। নাটকের মধ্যেও ডাকঘর, গুরু, রথের রশি, ফাল্গুনী, শারদোৎসব এবং কাব্য-নাটকের মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, আর সবার সেরা যেটি, লক্ষ্মীর পরীক্ষা—এই ক'টিকে ছোটদের পাঠ্যের তালিকাভুক্ত করলাম।

কিন্তু অন্যগুলির মধ্যেও দু'-চারটি ছাড়া, কোনোটিকেই ছোটদের অনুপযুক্ত বলতে ইচ্ছা করে না। হাজার হোক নাটক লিখে কবি তার অনেকগুলিই শান্তিনিকেতনে, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দিয়েই প্রথমে

অভিনয় করাতেন। ওগুলিকে যদি তিনি ছোটদের অনুপযুক্ত বলে মনে করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই এ-কাজ করতেন না। তাঁর কোনো নাটকে এমন কিছু নেই যা ছোটদের উপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তবে অমন অতুলনীয় রস অপাত্রে পরিবেশন করাও উচিত নয়। তাই তালিকা থেকে অচলায়তন, রক্তকরবী, রাজা ও রানী ইত্যাদি খান কুড়ির বেশি নাটক বাদ পড়ল। গল্পের বিচার যে কিভাবে করব ভেবে পাই না। 'সে' বইটির কথাই ধরা যাক। মনে আছে 'সন্দেশ' পত্রিকায় 'সে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ছোটদের গল্প বই কি। তবে বড় বেশি ধোঁয়াটে তার অভিব্যক্তি। ছোটরা তার মাথামুন্ডু সব সময় বুঝতে না পেরে রাগ-মাগ করত। তবে এইটুকু বলা যায় যে অনেকখানি বোঝা উচিত। দাদামশাই তার নাতনি আর 'সে' বলে এক রহস্যময় তৃতীয় ব্যক্তি, এদেরি মুখ্য ভূমিকা। অর্থাৎ গল্পগুলো এদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। অন্ততঃ দাদামশাই আর 'সে'র কাছ থেকে। নাতনি পুপুদিদি অধিকাংশ সময়ে শ্রোতা, সমালোচক এবং উপলক্ষ্য।

'সে' লোকটার পরিচয় অল্পে অল্পে প্রকাশ্য। এক দিন রাত দশটার পর দাদামশায়ের ঘরে এসে হাজির হয়ে বলল 'খিদে পেয়েছে, খেতে দাও'। ভাগ্যিস গলির মোড়ে খাবারের দোকান ছিল। তাই তার যখন তখন এসে ফরমায়েস করা মুড়োর ঘন্ট থেকে আইসক্রীম জোগানোতে অসুবিধা হত না। সে-র চেহারা খুবই স্পষ্ট। তার এবং গল্পের নানা অপ্রত্যাশিত চরিত্রের আর অভাবনীয় পরিস্থিতির ছবি কবি নিজে এঁকে দিয়ে গল্পের মূল্য শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আরেকটা কথা হল 'সে' মানুষটার আবছায়া রূপকে পুষ্ট ও স্পষ্ট করতে পুপুদিদিও সাহায্য করত। অন্য ব্যাপার-ত আছে গল্পে। 'সে' নাকি একবার শিবা-শোধন-সমিতির একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিল, সেটি দাদামশাই গল্পে জুড়ে দিয়েছেন। ঐ রিপোর্টটা সংক্ষেপে বললে বইটির মেজাজ আরো ভালো করে বোঝা যাবে।

হৌ-হৌ নামে এক লোমশ এবং সুশ্রী-ল্যাজযুক্ত শেয়াল 'সে'র কাছে এসে মানুষ হতে চেয়েছিল। সে তাকে দু-পায়ে হাঁটতে শেখাল। থাবা ঢাকবার জন্য জুতো মোজা দস্তানা পরাল। তবু 'সে'র মতো চেহারা না হবার কারণ জানতে চাওয়ার ফলে, অমন সুন্দর পাটকিলে রঙের ঝাঁকড়া ল্যাজটি কাটা হল। তারপর গায়ের লোমগুলোকেও ন্যাড়া করে ফেলা হল। শিবা সমিতির মানুষ সভ্যারা নিজেদের কীর্তি দেখে অবাক হলেন।

কিন্তু হৌ-হৌ-এর পিসি খেঁকিনী, চর লাগিয়ে ভাইপোর অনুসন্ধান করতে লাগল। এ নিশ্চয় মানুষদের কর্ম, এই রকম সন্দেহে চররা গাঁয়ের চারদিকে প্রহরে প্রহরে হুক্কা-হুয়া ডাক ছাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে হৌ-হৌ যখন ছুটে বেরিয়ে এল, তার ঐ রূপ দেখে শেয়ালরা যে যার গর্তে ঢুকল। হৌ-হৌকে তারা সমাজে নিল না। মনের দুঃখে হৌ-হৌ এখন কেঁদে বেড়ায়, 'আমার ল্যাজ কই'। আবার লোম উঠলে পিসি অন্ততঃ চিনতে পারবে এই ভরসা। বেশ দুঃখের কাহিনী। 'সে' নাকি নিজেকে এই রিপোর্টের লেখক বলে স্বীকার করে নি। উল্টে বেশ চটে গেছিল।

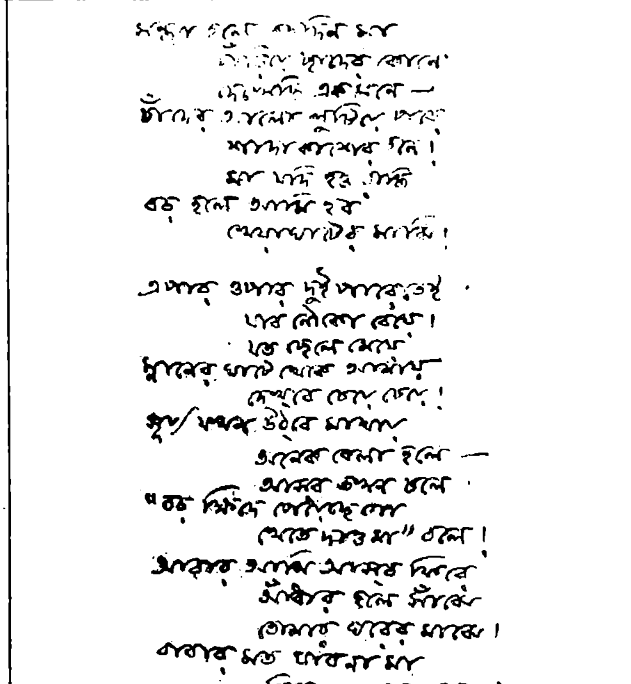
গেছোবাবার গল্পের রচয়িতা নাকি 'সে'। এগুলি সরস এবং সহজবোধ্য গল্প। কিন্তু 'সে'র বিয়ে নিয়ে বিভ্রাটের ব্যাপার বোঝে কার সাধ্যি। এই তো গেল কাহিনীর মেজাজ। প্রচুর মজার কথাও আছে। স্মৃতিরত্ন মশাই নাকি একবার মনুমেন্টের চূড়ো থেকে তলা অবধি চেটে অশুচি হয়ে গেছিলেন। অনেক কষ্টে পাঁড়েজির ডান্ডা দিয়ে দাঁতন করে শুদ্ধ হবার চেষ্টায় ছিলেন।

মস্ত লম্বা গল্প, রবীন্দ্ররচনাবলীর ৯৩ পাতা জুড়ে আছে। নাকি খামখেয়ালী গল্প, কবির সুহৃদ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করা। এইটুকু দেখেই মনে খট্‌কা লাগে। আজগুবির গল্পই যদি হবে তবে ঐ বয়সে—বুড়ো লোকটাকে উৎসর্গ করা কেন? শান্তিনিকেতনের আমুদে ছেলেমেয়েদের দিলেই তো মানাত বেশি। আসলে ব্যাপারটা অন্য রকম। আজগুবির বই নয় এটা। আজগুবি যারা পড়ে, তাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাই দিয়েই রস জমে। এ বইয়ের ২/৩ ভাগেরই মানে ছোটদের খুব সহজে ঠাওর হয় না। বড্ড জটিল সমস্ত ব্যাপার। খামখেয়ালী লেখা আর আজগুবি গল্পের ঐখানেই তফাৎ। খামখেয়ালীপনাটাতে লেখকের একতরফা দখল। পাঠক বুঝল কি বুঝল না, সেটার তেমন গুরুত্ব নেই।

শিশুসাহিত্যের মেজাজ এ-নয়। শিশুসাহিত্যের আজগুবি লেখা অন্য ধাঁচের। প্রত্যক্ষ, প্রকট। ভুল বোঝার কোনো সুযোগ নেই। সমালোচনা করবার জন্য কোনো পুপুদিদির দরকার নেই। অস্বীকার করবারো উপায় নেই। কারণ প্রথম পাতা থেকেই পাঠকরা সবাই লেখকের সঙ্গ ধরে এবং একেবারে গল্পের শেষ দাঁড়ি পর্যন্ত তাঁকে ছাড়ে না। কোনো চালাকির সুযোগ তিনি পান না। ঐ যে সব চমৎকার ছবি আছে সে-র পাতায় পাতায়, গল্পের চেয়েও সেগুলিকে বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল-তেও মজার মজার ছবি আছে। কিন্তু গল্পকে তারা কখনো ছাপিয়ে ওঠে না। আমার মনে হয় খামখেয়ালী গল্প আর আজগুবি গল্পের মধ্যিখানে দুস্তর সমুদ্র আছে। আজগুবিতে ভুল ধরার, মন খারাপ করার, এমন কি ভালোমন্দ বিচার করারো কোনো সুযোগ থাকে না। কিন্তু 'সে'র শেষটা পড়ে কার না কান্না পায়?

'সে' বলতেই গল্পসল্পের কথা মনে পড়ে। কবি তখন বুড়ো হয়েছেন, প্রায় আশী বছর বয়স। বইটি উৎসর্গ করেছেন নাতনি নন্দিতাকে। এই উৎসর্গপত্রের শেষটুকু পড়লে, 'সে'র মেজাজের সঙ্গে একটু তফাৎ ধরা পড়বে।

"বিধাতা পরিয়ে দিল আজ
নারদমুনির এই সাজ।
তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার ঃ
এ-কাজ সবচেয়ে কম চেষ্টার।
তবে শোন—মন্দ সে মন্দই,
হক না সে গুপিনাথ, হক না নন্দই।
আর শোনো—ভালো যে সে ভালো,
চোখ তার কটা হক, হক বা সে কালো।"



এ যে আজগুবি নয়, সেতো বোঝাই যাচ্ছে। কারণ আজগুবির যুক্তিগুলোও বেজায় আজগুবি। খামখেয়ালীও নয়, পড়ে মনে হয় একেকজন সত্যিকার মানুষকে, সত্যি ঘটনাকে লেখার সামনে ধরে এনেছেন। ১২/১৩টি রচনা। বিজ্ঞানীকে তো ছোঁয়া যায় মনে হয়। মুনশিও কম যায় না। রূপকথাও আছে, সুন্দর রূপকথা। তবে ছাড়া ছাড়া আলাদা আলাদা লেখা, কোনো একটা স্পষ্ট আবহাওয়া তৈরী হতে পারে না। লেখার মধ্যে খুব একটা গোপ্পে ভাব-ও ফুটতে পারে নি। ছবিও নেই। তার দরকার-ও নেই। ছেলেমানুষি কোথাও না থাকলেও, বড় ভালো ভালো কথা আছে। ছোট ছেলেকে জানতে তাঁর বাকি ছিল না। বিশেষ করে সুকুমার ভাবুক ছোট ছেলেদের, মস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটাকেই দেখে অবাক হয়। ঐটিই হল ছোট হবার বড় লাভ। অনেক দুঃখের সান্ত্বনা ওরি মধ্যে। ইংরিজিতে ওকেই বলে 'the gift wonderment'। ওটি না থাকলে কেউ ছোট ছেলেমেয়েদের মনের কথা বুঝতেও পারে না, তাদের মনের মতো কথা বলতেও পারে না। রবীন্দ্রনাথের ঐ গুণটি ছিল বলেই তিনি এত বড় কবি হতে পেরেছিলেন। ওর-ই জোরে এত দুঃখ পেয়েও, পৃথিবীকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন। ঐ গুণের জন্যই তাঁর অপূর্ব সব রচনার আধ-খামচা মানে বুঝেই ছোট পাঠকরা মুগ্ধ হয়। ওর মূলে আছে সত্যের আর সুন্দরের প্রতি ভালোবাসা, যাকে খুঁজলে সব শিশুর মধ্যেই পাওয়া যায়।

জীবনের শেষ পর্যন্ত বিশ্বের মঙ্গল নিয়মের প্রতি কবির মনে গভীর আস্থা ছিল। বিধাতার মঙ্গল বিধান নিয়ে কোনো সময়ে তাঁর মনে সংশয় উঠেছিল বলে মনে হয় না। আমরা তাঁকে বিচার করি তাঁর লিখিত সাহিত্যকর্ম ও তাঁর চিঠিপত্র থেকে। যাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল, তাঁদের কারো কারো লেখায় কবির চিত্তের এই বলিষ্ঠতার কথা প্রকটভাবে না হলেও, ইঙ্গিতে আছে। মনে হয় এই গভীর বিশ্বাসের জন্য তাঁর মনে এতখানি আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠেছিল যে নিজের স্কুল-কলেজের অভিজ্ঞতা অত কম থাকা সত্ত্বেও, বিশ্বভারতীর মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।



এত কথা বলার উদ্দেশ্য হল যে তাঁর সব কাজে ও রচনায় তিনি ঐ বলিষ্ঠতার জয়গান করেছেন। ঐ একই কারণে তিনি কোনো রকম খোকামি সইতে পারতেন না। এমন কি তাঁর লিখিত সহজপাঠের প্রথম ভাগেও খোকামির চিহ্নমাত্র নেই। ছোটদের সঙ্গে মিলে আধো-আধো বুলি মুখে আনা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ হত। আজ পর্যন্ত যত বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'সহজপাঠ'কেই সাহিত্যগুণে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। কবিতাগুলির তুলনা হয় না। সেগুলিকে বাদ দিলেও পাঠ্যাংশের একটা বিশেষত্ব দেখতে পাই। পদে পদে ধাপে ধাপে ছোট শিশুকে যেন তার পরিবেশ আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে চেনা করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নাটকে নভেলে রবীন্দ্রনাথ বহু রাজারাজড়া, বীর, পন্ডিত এবং নানা অসাধারণ গুণসম্পন্ন চরিত্রদের উপস্থিত করলেও, সহজপাঠে যারা এসে হাসিমুখে সামনে দাঁড়ায়, তারা প্রায় সকলেই সাধারণ লোক, গ্রামে থাকে, চাষবাস করে, মাছ ধরে, জমিদার বাড়িতে কেউ কেউ কাজ করে বলে মনে হয়। ছোট ছেলেপুলে অবিশ্যি তেমন করে চোখে পড়ে না, একটা ছোট কাঁদুনে খুকী ছাড়া। অনেক সময়ই মনে হয় এই সংসার-ছাড়া মানুষটি যত ভালো করে সংসারের খুঁটিনাটি দেখতে পেতেন, সংসারী মানুষরা ততটা পায় না। কে না জানে যে কোনো দৃশ্যের দর্শকরা খুঁটিনাটি সুদ্ধ যতখানি দেখতে পায়, নাটকের পাত্র-পাত্রীরা ততটা পায় না, কারণ তারা যে যার নিজের ভূমিকায় ডুবে থাকে। নৈর্ব্যক্তিকভাবে কিছু দেখার মতো অবস্থা তাদের নয়। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের মস্ত সুবিধা ছিল। সমস্ত জগৎকেই তিনি নিষ্কামভাবে দেখবার গোপন মন্ত্র জানতেন। হয়তো ছোটবেলা থেকেই এই বিদ্যা রপ্ত হয়েছিল, জানালার খড়খড়ি ফাঁক দিয়ে যখন তিনি দুনিয়া দেখতেন, কিন্তু কোনো কিছুতেই যোগ দিতেন না। জাতশিল্পীদের, জাতলেখকদের এই গুণটি থাকে। তাঁরা জীবনের দর্শক। এমন কি নিজের বাইরে থেকে নিজের মনকে দেখার ক্ষমতাও তাঁদের থাকে।

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'র প্রসঙ্গে এত কথা বললাম। আগে বলেছিলাম কেবলমাত্র তারাই ছোটদের জন্য লিখতে পারে, যারা নিজেদের ছোটবেলার ঘটনা অনুভূতি সব মনে রাখে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটবেলাকার যে সমস্ত দৃশ্য মনে রেখেছেন, তার প্রায় সবই দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে। বড়দের জীবনের টুকরো টুকরো। নিজেদের শৈশবের ব্যাপারেও নিজে যেন দর্শকমাত্র, খুব একটা কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছেন না। যা দেওয়া হচ্ছে খাচ্ছেন-পরছেন, ডন-বৈঠক, কুস্তি, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যচর্চা, গানবাজনা—এইসব শিখতে শিখতেই দিন কেটে যেত। স্কুল নিয়ে নিত দিনের মধ্যিখান থেকে অনেকখানি সময়। অবকাশ মিলত সেই রাতে শুতে যাবার পর। কিম্বা ছুটির দিনে। তাও বেশিরভাগ দর্শকের ভূমিকায়। তিনতলার ছাদ থেকে পাড়ার ওপর তলার দৃশ্য দেখে। অনুপস্থিত বাবার গোসলখানায় ধারাস্নান করে, তাঁর কৌচে বসে দিবাস্বপ্ন দেখে।

কিন্তু সে ছিল দেখার মতো দেখা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ছোটদের মহল, মেয়েদের মহলের আচার তৈরি, বড়ি দেওয়া, গল্পগুজব করা। পরে নিজেও তাতে যোগ দিতেন, পৌলবর্জিনীর গল্প পড়ে সবার চোখে জল এনে, মিহি করে সুপুরি কেটে, পড়তে পড়তে জোড়াসাঁকোর সব অধিবাসীদের, অতিথিদের, অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। নাটুকের দল নাটক দেখায়, জাদুকর খেল দেখায়। জ্যোতিদাদার সঙ্গে শিলাইদহ যাওয়া; ফুলের রস নিংড়ে কবিতা লেখা; খালি পায়ে বিনা তোড়জোড়ে বাঘ শিকারীদের দলে জোটা আর বাঘের বেদনাময় মৃত্যু দেখে শিকার-বিমুখ হওয়া। বলছেন যে, প্রথমবার শিকারে গেলে, যে-বাঘটা রূপের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে ন্যাড়া ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে দৌড়ে উল্টো দিকের বনে গিয়ে ঢুকেছিল, সেই শিকারটিই ছিল তাঁর মনের মতো। খালি পায়ে একটা গাছের একটুখানি উঠে সব দেখে তাজ্জব বনেছিলেন। রক্ত পড়েনি, কেউ মরেনি, কিচ্ছু না।

সমস্তটা সহজ ভাষায়, গল্পের মতো করে বলা। মায় সেই যে আবদুল মাঝি, যে জ্যোতিদাদাকে তাজা ইলিশমাছ আর কচ্ছপের ডিম জোগাত, তার মুখের লোমহর্ষণ গল্প পর্যন্ত! সব ছোট ছেলেমেয়েদের এ বই পড়া উচিত। সকলে উপভোগ করবে। এটিই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ

ছোটদের বই। এর জুড়ি বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দায়। তবে এও কিশোরবয়স্কদের জন্য, শিশুদের বই নয়। এবং এও বড়োমানুষের মন দিয়ে ছোটবেলাকে ফিরে দেখা নয়। ছোটবেলাতেই যে মানুষ তার ছোটবেলার সবখানি উপভোগ করবার সুযোগ পেল না, তার আবার ফিরে যাওয়া কিসের।

ঐ 'ছেলেবেলা' বইটিতেই তাঁর হঠাৎ বড় হয়ে ওঠার ইঙ্গিতও আছে। তাতে তাঁর জ্যোতিদাদা আর বৌঠাকরুণের অনেকখানি ভূমিকা। দেখতে দেখতে ছোটবেলার জাদু চোখ থেকে মুছে গেছিল। ১৫ বছর বয়সে তাই 'ভানুসিংহের পদাবলী' লিখতে পারলেন। তার সঙ্গে ছোটবেলার কোনো সম্পর্কই নেই। এর পর যেখানেই ছোটবেলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দেখছি, সর্বদাই সেই গুরুশিষ্যের সম্পর্ক, কিম্বা দাদামশাই নাতনিকে ঐ গুরুর মতোই জ্ঞান দিচ্ছেন। এমন কি নাতনিদের উত্তরের বা জিজ্ঞাসার মধ্যেও এতটুকু ছেলেমানুষি পাই না। রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্যর ঐ যে দুটি ভাগের কথা বললাম—এক হল ছোটদের বিষয়ে রচনা, আরেক হল ছোটদের জন্যে রচনা, এর মধ্যে প্রথমটির জুড়ি বাংলা সাহিত্যে আর নেই। আর দ্বিতীয়টি শৈশবের কোমল বেদনা আর বঞ্চিত জিজ্ঞাসা নিয়ে যেমন করে মনকে নাড়া দেয়, তেমন আর কে বা পেরেছে। তবে পরিপূর্ণ ছোটবেলার মেজাজ কোথাও ধরে দেওয়া হয় নি।

ছোটদের জন্য নাটক লেখা খুব সহজ নয়। রস জমাতে হলে মজার পরিস্থিতি ও তার উপযুক্ত সংলাপ উদ্ভাবন করতে হয়। সেটা সবাই পারে না। হাল্কা বলতে খেলো ঠাট্টা আর ফাজলামিকে ছোটদের উপযুক্ত বলে চালাবার চেষ্টা করা যায় না। মজার মধ্যেও কোনো অযোগ্য পরিহাস থাকলে চলবে না। আবার অন্যদিকে বড় বেশি গুরুগম্ভীর করলে সব চেষ্টা বিফল হবে। আসলে খুশির নাটক আর আদর্শ শিক্ষার নাটক দুটি আলাদা জিনিস। আমার মনে হয় দ্বিতীয়টি লিখবার লোক যদি বা দেখা যায়, প্রথমটির কালেভদ্রে আবির্ভাব হয়। খুশির নাটক বলতে অবিমিশ্র হাসি-তামাসা না হলেও চলে। হাসির মধ্যে থেকে অনেক সময়ই চমৎকার একটা শিক্ষা প্রকাশ পেয়ে যায়। হাসির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় বলে, আরো বেশি করে মনে ধরে। এদিকে রবীন্দ্রনাথের গম্ভীর নাটক মনের মধ্যেকার মানবিক বোধে এমনি নাড়া দেয় যে নাটকে বক্তব্যটি ফুলের মতো ফুটে ওঠে।

এইসব নাটকের কোনটি যে ছেলেদের উপযুক্ত আর কোনটি যে নয়, সে বিচার করা মুশকিল। তবে কাব্যের বেলাও যে কথা খাটে, এর বেলাও তাই। কথার মানে বুঝতে পারলেই সবটা হয়ে গেল না। এখানেও ভাবের কথা ওঠে। খুব কম কিশোরই হয়তো সব নাটকের সবটুকু উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে নাটকগুলিতে আপত্তিকর কিছুই নেই। যা আছে তা হ'ল অপূর্ব সব আদর্শবাদ, গভীর সব বেদনার কথা, মানবিক দেবদুর্লভ সমবেদনা। এসব শিক্ষা ছোটদের চিন্তাধারার উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তার তুলনা নেই। কিন্তু ভাব ও রস সবসময় ছোটরা বুঝতে পারে কি না সন্দেহ হয়। নাটকটি বসে বসে পড়তে হলে সবসময় ছোটদের ভালো লাগে না। কিন্তু মঞ্চস্থ হবামাত্র ব্যাপারটা পাল্টে যেত। বিশেষ করে কবি যখন কিশোর বয়স্ক অভিনেতাদের নানা ভূমিকায় নামাতেন। আমার মনে হত নাটকের মূল বক্তব্যটি তাদের এমনি পেয়ে বসত যে সংলাপ সব স্পষ্ট হয়ে উঠত। ঐ নাটকের মেজাজ তারা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করত। লিখবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পাঠক বা দর্শকদের বয়স অনুসারে মনে মনে শ্রেণী বিভাগ করতেন না। সব বয়সী দর্শকরা নাটক উপভোগ করত। সব বয়সী অভিনেতারা নায়ক মঞ্চস্থ করত।

আমার মনে আছে, ১১/১২ বছর বয়সে আমি প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাটক পড়েছিলাম, বিসর্জন। পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বাংলায় কাঁচা ছিলাম, কিন্তু কোথাও একটি পদও শক্ত বলে মনে হয় নি। সমস্ত ভাব আর রস, দু-হাত পেতে গ্রহণ করেছিলাম। জয়সিংহের স্বার্থত্যাগে বুক ফেটে গেছিল। কিছুদিন আগে আমার এক কম-বয়সী সাহিত্যিক বন্ধু বলেছিলেন 'বিসর্জন' নাটকটিকে কোনোমতেই ছোটদের যোগ্য বলা যায় না। কারণ মানে বুঝতে পারলেও, গুণবতীর ঐ সন্তানের জন্য বুভুক্ষা, রঘুপতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এসব কি ছোটরা ঠিক অনুধাবন করতে পারে? আমার মনে হয়, এই বিশেষ নাটকের ঐ যে দয়ার আদর্শ, বলিদান বন্ধ করতে হবে—তাতে সব ছোটদের মন সাড়া দেয়। তাছাড়া এদেশের ছেলেরা রামায়ণ, মহাভারত, ঠাকুরমার ঝুলি পড়ে মানুষ হয়। মানব মনের কোনো দুর্বলতা ওদের অজ্ঞাত নয়। নির্মল চিত্তে তারা সব পাপ-পুণ্য গ্রহণ করতে জানে। তাই বলেই অবিশ্যি বড়দের নাটক ছোটদের নাটক হয়ে যায় না। গুণবতীর ছেলেমেয়ে নেই, সে তো তাদের চাইবেই। সেটাই তো স্বাভাবিক।

এখন মুশকিল হল, ছোটদের জীবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশি নাটক লেখেন নি। তাই যদি বলা যায়, দেশের রূপকথা, উপকথাগুলোর কোনটা ছোটদের জীবন নিয়ে লেখা? কবি 'হাস্য-কৌতুকে' বিশেষ করে ছোট ছেলেদের জীবন নিয়ে যে নাটক লিখেছেন, তাকেও ছোটদের উপযুক্ত বলে আমি মনে করি না। হাস্য-কৌতুকের 'ছাত্রের পরীক্ষা' নাটিকাটির কথা মনে পড়ছে। নাটকটি ছোট ছেলেদের অনুপযুক্ত মনে হয়। চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি দিয়ে মাস্টার মশাইকে অপদস্থ করাটা কেমনধারা রস হল, বুঝতে পারলাম না। হাস্য-কৌতুকে নির্মল সুকুমার হাসির খোরাক কই? কোনো নাটকেই পাই না। যেখানে কিছু কিছু মজার খোরাক আছে, তারো তলায় তলায় হিংসার প্রতিধ্বনি শুনি।

এই প্রসঙ্গে 'কাল-মৃগয়া' আর 'বাল্মীকি-প্রতিভার' কথা উল্লেখ করা যায়। কাল-মৃগয়া হল গীতিনাট্য; বাল্মীকি-প্রতিভাও তাই, তবে অনেক আগেকার রচনা। শান্তিনিকেতনে 'কালমৃগয়া' দেখেছি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা করেছে, অন্ধমুনি, দশরথ একটু বড়। বহু পরিচিত গল্প, না বোঝার কিছু নেই। কবির নতুন শেষটি বড়ই মধুর। দশরথকে অভিশাপ না দিয়ে, পুত্রশোকাতুর অন্ধমুনি তাঁকে ক্ষমা করলেন—

"শোক তাপ গেল দূরে,
মার্জনা করিনু তোরে।"

এই সুন্দর পরিণাম সমস্ত ছোট ছেলেমেয়েদের মুগ্ধ করে। সাধারণতঃ দোষীকে সাজা দিলে তারা খুশি হয়। কিন্তু এখানে ঋষি বালকের মৃত্যুটি নিতান্ত আকস্মিক। ছোটদের দৈনন্দিন জীবন শত শত ছোট ছোট আকস্মিক ও অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনায় ভরা। তার জন্য তাদের যথেষ্ট শাস্তিও ভোগ করতে হয়। এই অপূর্ব ক্ষমাটি তাদের মনের মতো জিনিস। নিজেরা তা সবসময় পায় না।

কিন্তু পঞ্চম দৃশ্যে শিকারীদের আবির্ভাব ও লম্ফ-ঝম্ফ এবং বন-কাঁপানো হৈ-হল্লা, ছোট দর্শক ও ছোট অভিনেতা উভয়ের কাছে যতই উপভোগ্য হক না কেন, এ-রকম আচরণ কোনো সত্যিকার শিকারী সমর্থন করবে না। হিংসার গন্ধ পেয়ে নয়, আচরণটা শিকারী সুলভ নয় বলে। শিকারীদের বুলি তো হিংসাত্মক হবেই, কিন্তু যারা ঝাঁপে থাকে তারাই ঐ রকম চ্যাঁচায়, টিন পেটায় শিঙা বাজায়। যাদের হাতে বল্লম, ধনুর্বাণ থাকে, তারা নিঃশব্দে খাপে দাঁড়ায়। আমি অবিশ্যি শিকার-টিকার করি নি, এমন কি দেখিও নি, তবু মনে হয় ওটা বাস্তবানুগ হয় নি। তাই বলে ফূর্তিটা কিছু কম যায় না। তবু বলব ঐ ফূর্তিতে নির্মল সুকুমার আনন্দের লেশমাত্র নেই। আছে একটা উদ্দাম ফূর্তি। কিন্তু সেটিও কিছু কম উপভোগ্য নয়।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'তে যেমন একটা গভীর গম্ভীর দিক আছে, তেমনি একটা হালকা মজার দিক-ও আছে। সেটি প্রথম দৃশ্যেই প্রকাশ পেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে জমিয়ে দেয়। দস্যুগুলোর মধ্যে একটা ছেলেমানুষি লক্ষ্য হয়, যা যে-কোনো ছোট ছেলের মন হরণ করবে। প্রথম দস্যুই বহু ছোট ছেলের মনের কথা বলে ফেলেছে ঃ—

'আঃ বেঁচেছি এখন! শর্মা ও দিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন।
লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দাঁতকপাটি,
তাই মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কেমন!'

এই মেজাজটি ছোটদের ভারি উপভোগ্য। অন্য দস্যুরাও কম যায় না। লুটপাট করে মাল আনলেও, তারা ভারি আমুদে। দলের পান্ডা বাল্মীকি

এসে জুটতেই ঐ মেজাজটি গেল নষ্ট হয়ে। দস্যুরা ছোট মেয়েটিকে ধরে নিয়ে চলল, যখন কালীমূর্তির কাছে আনল, তখন বাল্মীকি বলছেন—লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা। বলি দেখে তাঁর চোখে জল এল। বুকে করুণার উৎস খুলে গেল। আসলে সেই মুহূর্তেই রত্নাকর দস্যু বাল্মীকি হলেন। এই রহস্য বুঝতে কোনো ছোট ছেলেমেয়ের অসুবিধা হয় না। তাই এই দু'টি নাটককে আমি ছোটদের নাটকের তালিকায় রেখেছি। বলেছি তো, এমন বহু নাটক আছে, যাতে আপত্তিকর কিছু নেই, সব মানে বুঝতে পারছে ছোট পাঠকরা, তবু তার মেজাজটির জন্য তাকে ছোটদের জন্য রচনা বলা যায় না। এ-দু'টির ভাব, রস ইত্যাদি সবই ছোটদের উপভোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। এর অনুকরণে নাটক লেখা বড় শক্ত। লিখতে পারতেন হয়তো উঁচু দরের আদর্শবাদী কোনো কবি। সেরকম কাউকে দেখতে পাই না। তাছাড়া এ ধরনের নাটককে সবাই বলবে সেকেলে। রবীন্দ্রনাথের রচনা, অপূর্ব সব গান আর অদ্বিতীয় কাব্যগুণ, এর তুলনা কোথাও পাওয়া যাবে? আজ পর্যন্ত নাটকগুলির নিজস্ব আলাদা একটি স্থান। রবীন্দ্র-নাটক-গোষ্ঠী বলে কিছু আজকাল দেখি না। তবু বলি, ১০ থেকে ১৬ পর্যন্ত যাদের বয়স, তাদের নাট্যগুণ উপলব্ধি করতে, নাটকের প্রভাব অনুভব করতে, এক কথায় নাটক উপভোগ করতে, এর চেয়ে ভালো কিছু নেই।

তবে একটা কথা হল যে নাটক বলতে আমরা এমন জিনিসই বুঝি যা মঞ্চে, বা যাত্রার আসরে, বা যে-কোনো জায়গায়, অভিনেতার সাহায্যে উপস্থাপিত করা যায়। যে নাটক মঞ্চস্থ করাতে অসুবিধা আছে, সে আসলে নাটক নয়। হয় তো সংলাপ বলা যায়, বা ঐ রকম কিছু। যারা অভিনয় করে, বা নাটক দেখে, এমন কি নাটকের মহড়াও দেখে, তাদের কাছে নাটকের অস্পষ্ট জায়গাগুলোও বোধগম্য হয়ে যায়। যা ছিল বাইরের জিনিস, বইয়ে ছাপা নাট্যকারের রচনা-মাত্র, দেখতে দেখতে নিজেরাই তার অংশীদার হয়ে ওঠে। তখন তাকে বুঝতে কোনো অসুবিধাই থাকে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকের বেলাতেও এই রহস্যই সংঘটিত হতে বারবার দেখেছি। তাই, 'শারদোৎসব', 'গুরু', 'রথের রশি', 'ডাকঘর' ইত্যাদি সব-ই কিশোরদের উপভোগ্য। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র কথা তো আগেই বলা হয়েছে। সবগুলির মধ্যেই একটি করে উচ্চ আদর্শের পরিচয় আছে বটে কিন্তু হাসির কথা বেশি নেই।

শারদোৎসবে লক্ষেশ্বর হল লোভ ও বিষয়াসক্তির প্রতীক, উপনন্দ আদর্শবাদের। সন্ন্যাসী এসে বালকের দলকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিলেন। 'গুরু'র মুখপত্রে ১৩২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি 'গুরু' নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল'। মূল নাটকটির রচনাকাল ১৩১৮। মনে হয় কবি ভালো করেই জানতেন অতিরিক্ত গুরুগম্ভীর তত্ত্ব মঞ্চে উৎরানো শক্ত। তাই লঘুকরণ। 'গুরু' নাটকের বিষয়বস্তু আসলে ছোটদের জন্য নয়, বরং ছোটদের অভিভাবক আর মাস্টার মশাইদের জন্য। সমস্ত নাটকটি রক্ষণশীলতা, অন্ধ নিয়ম পালন, ক্রিয়া-কর্ম, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। ভারি এক উদার জীবনযাত্রার ইঙ্গিত আছে নাটকে। ছোঁয়াছুঁয়ি আর সবরকম গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-র গল্প। কিশোর পঞ্চক সেই বিদ্রোহের প্রতীক। সে গিয়ে অস্পৃশ্য, বুনো যূনকদের সঙ্গে মিশত। দর্ভকরাও অস্পৃশ্য, তাদের এক গোঁসাই ছিল, যেমন যূনকদের এক দাদাঠাকুর ছিল। এরা অচলায়তনের বাইরের দেয়াল দিল ভেঙে। সূর্যের আলোয় ভরে গেল জায়গাটা। রক্ষণশীল পন্ডিতরা তাঁদের আচার্যের জন্য অপেক্ষা করছিল। শেষে দেখা গেল গোঁসাইতে, দাদাঠাকুরে, আচার্যে কোনো প্রভেদ নেই। সবাই এক। অন্যান্য নাটকের মতো 'গুরু'তেও অপূর্ব সব গান আছে।

'ডাকঘর' নাটকটি এতবার এত সার্থকভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে যে তার গল্পটি সকলের জানা। নায়ক একটি ছোট রুগ্ন ছেলে। মা-বাবা নেই তার, পিসির [illegible] পরম আদরে মানুষ হচ্ছে। কাল-রোগে ধরল তাকে। খেলাধুলো [illegible] কাছে বসে দুনিয়া দেখে সে। ছোট বন্ধুরা আসে তার কাছে। ডেকে পথিকদের সঙ্গে ভাব করে। খালি মোড়ল ওর কথায় ভোলে না। আর সবাই তাকে ভালোবাসে। বড় করুণ নাটক। সবাই বুঝছে অমল আর ভালো হবে না। অমলের মনে এতটুকু ভয় নেই, খালি আনন্দ। সে দূরের পাহাড়ের পিছনে কি আছে জানতে উৎসুক। রাজার সঙ্গে দেখা করবার বড় ইচ্ছা। তার মনে প্রত্যয় তিনি আসবেন ওর কাছে। তারি জন্যে আকুল অপেক্ষা। গভীর রাতে অমল ঘুমিয়ে পড়ল। রাজা এলেন তাঁর কাছে। তাঁকে কেউ দেখতে পেল না। দেখল শুধু রাজকবিরাজকে। এই মৃত্যুঞ্জয়ী নাটিকায় একটিও গান নেই, রসিকতা নেই। শুধু নিশ্বাস বন্ধ করে মরণের প্রতীক্ষা। আর তার পরে সব আলোয়-আলো।

এ কি ছোটদের মনের মতো গল্প? কিন্তু ছোটদের এ গল্প বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না। মৃত্যুর কথা তারা জানে। মানুষ মরে গেলে ভগবানের কাছে চলে যায়। সেখানে কোনো দুঃখ নেই, চারদিক আলোয় আলো। সব ছোট ছেলেরাই সে রাজ্যের কথা জানে। ভগবান নিজে সেখানে রাজা।

যে সময়ে গান্ধীজি দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করার কথা বলছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'রথের রশি' লিখলেন আর মঞ্চস্থ করলেন। 'গুরু'তে যে উঁচু-নিচুর ভেদ ঘুচাবার ইঙ্গিত আছে, এখানে সেই চিন্তাটাকে নির্ভীকভাবে, প্রবলভাবে, প্রচন্ড স্পষ্টতার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো কিশোরের তার ভাষা, ভাব, রস, ব্যাকুলতা বুঝবার অসুবিধা হয় না। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসে একে ছুঁতে নেই, এরা উঁচু জাত, ওরা নিচু জাত। আরেকটু বড় হলেই আবার উল্টো কথাও কানে আসে। আমাদের দেশের এই দুর্গতির মূলে যে ঐ জাতি-ভেদ তা-ও শোনে। 'রথের রশি'র মর্মকথা তাদের বোঝার বাইরে নয়।

চমৎকার লেখা। ডাকঘরের মতোই কবি গানের সাহায্য নেননি কোথাও, বক্তব্যকে হাল্‌কা করার চেষ্টা করেননি। বক্তব্যটি বজ্রের মতো বুকে বাজে। অথচ পরিণামটি কি সহজে, কি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। সাদাসিধে ঘটনা। রথের দিন রথের চাকা গেল আটকে, রথ-টানার দড়ি হয়ে উঠল জগদ্দল পাষাণের মতো ভারি। তাকে তোলে কারো সাধ্যি নেই। একে একে সকলে হার মানল। রাজারাজড়া, সৈন্যসামন্ত, পান্ডা-পুরোহিত, পন্ডিত-জ্ঞানী, বণিক-ব্যবসাদার, সাধু-ভক্ত। এমন কি গাঁয়ের মেয়ে-বৌরাও যখন নিজেদের হাতে নৈবেদ্য সাজিয়ে দড়ি-দেবতাকে পূজো দিতে এল, সে নৈবেদ্য কাদায় গড়িয়ে পড়ল। এমন অলুক্ষুণে ব্যাপার দেখে সকলে শিউরে উঠল। সন্ন্যাসী এসে ভবিষ্যদ্বাণী করল এবার সর্বনাশ হবে। বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মহামারী, ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

সবাই যখন হতাশায় ভেঙে পড়েছে, তখন শূদ্ররা এসে দড়িতে হাত লাগাল। অমনি দড়ি কি সহজে ওদের হাতে উঠে এল। এক সঙ্গে, এক তালে, টান পড়তেই, কাদা থেকে চাকা উঠে, শক্ত মাটির পথের উপর দিয়ে চাকা গড়িয়ে চলল। তখন একে একে সবাই এসে রশি ধরল। সন্ন্যাসীও এসে বলল, জয়! মহাকালনাথের জয়।

এই প্রচন্ড নাটকের বাণী কিশোরদের জন্য, যুবকদের জন্য, যাদের হাতে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ গড়বার ভার। এতো বুড়োদের নাটক নয়। তবে ছেলেমানুষি খুঁজে পাই না কোথাও। ছোটদের সব বইতেই ছেলেমানুষি থাকার কি দরকার আছে? ছেলেমানুষরা বড় অবোধ, বড় অর্বাচীন। তাদের তো বড় করে তুলতে হবে। ছোটদের সাহিত্যে রস চাই, আনন্দ চাই, একথা সবাই শুনেছে। এসব নাটকেও এক রকম বলিষ্ঠ আনন্দ আছে। সন্ন্যাসী এসে যে জয়ধ্বনি দিল, সে হল আনন্দের ধ্বনি।

আগাগোড়া আনন্দের নাটক খুঁজে পাই না। 'মজা করা' কোনো নাটকের উদ্দেশ্য নয়। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'তে অনেক হাসির খোরাক আছে। আগাগোড়া কাব্যে লেখা। একটিও পুরুষ চরিত্র নেই। একেবারে প্রমীলা রাজ্যের ব্যাপার। রানী কল্যাণীর দয়ার শরীর। দুঃখী দুর্গতরা তাঁর কাছে এলেই টাকাকড়ি, কাপড়চোপড় আর পেট ভরে খেতে পায়। দেখে রানীর ঝি ক্ষীরির চোখ টাটায়। তার মতো লোভী, মৎলবী, উপস্থিতবুদ্ধি মেয়েমানুষ আর কোথাও নেই। তার উপর বেজায় হিংসুটে আর অকৃতজ্ঞ।

নিজের আত্মীয়-স্বজন এনে পোষে, গরীবদের ভাগ থেকে সরায়, তবু মন ওঠে না। শোবার সময় মা-লক্ষ্মীকে ডাকে, তাঁর যদি দয়া হয়। তা একদিন মা-লক্ষ্মীকে ডেকে সবে ঘুমিয়েছে, এমন সময় দরজায় টোকা। কাঁচা ঘুম ভেঙে রেগেমেগে ক্ষীরি দরজা খুলেই দেখে; হীরে জহরতের গয়না পরা, দামী শাড়ি গায়ে, সে যে কি সুন্দরী একজন দাঁড়িয়ে আছেন। তবু তাঁকে একটু বাজিয়ে দেখে, ক্ষীরি তাঁকে মা-লক্ষ্মী বলে চিনতে পারল। ক্ষীরি রাণী হতে চায়। মা-লক্ষ্মী তাকে বারবার সাবধান করে দিলেন, দেখিস্, শেষটা আমার যেন অপমান না হয়। ক্ষীরি বলল—আমাকে দাসীজন্ম দিয়েছ তাই দাসীর মতো স্বভাব হয়েছে। রানী হলে রানীর উপযুক্ত স্বভাবই হবে।

মা-লক্ষ্মী বললেন, 'তথাস্তু, রানী করে দিনু তোকে। দাসী ছিলি তুই ভুলে যাবে লোকে।'

তার পরের দৃশ্যে ক্ষীরি রাণী হয়েছে, মালতী বলে তার খোসামুদে সভাসদ্। সে আরেক কাটি বাড়া। কাউকে ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে গোছের। দু'জনে মিলে প্রজাদের ওপর সে কি অত্যাচার। একটা পয়সা কাউকে দেয় না, সকলকে অপমান করে। প্রজারা তাকে দেখতে পারে না। ক্ষীরির কাছে একদিন দীনহীন বেশে, ঘোমটা মাথায়, একজন আশ্রয়-প্রার্থী হয়ে এলেন। তিনি রাণী কল্যাণী, শত্রুরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেছে। তাই ক্ষীরির কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন, যদি রাজ্যোদ্ধারের ব্যবস্থা করা যায়। আপাতত একটু আশ্রয় পেলেই তিনি কৃতজ্ঞ হবেন।

এই নিঃস্ব রাণী কল্যাণীর ওপর ক্ষীরির দয়া হল না। সে তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। তখন ঘোমটা ফেলে তিনি নিজের মূর্তিতে বেরিয়ে এলেন। রাণী কল্যাণী নয়, স্বয়ং মা-লক্ষ্মী। তিনি ক্ষীরিকে তিরস্কার করতে লাগলেন।

তারপর শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, ক্ষীরি তার নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে—

> 'যাবে যদি যাও ছেড়ে যাও মোরে
> দস্তুর মতো কুর্ণিশ করে!'

অর্থাৎ সবটাই স্বপ্ন। কিন্তু ক্ষীরির তেজ এতটুকু কমে নি। মা-লক্ষ্মীর ওপর তম্বি করছে।

ক্ষীরির চ্যাঁচামেচি শুনে রাণী কল্যাণী উঠে এসে, তাকে জাগিয়ে দিলেন। তাঁর স্নেহস্পর্শে এতক্ষণ পরে ক্ষীরির চৈতন্য হল। সে চোখ মুছে উঠে বসে বলল,

> 'কিজানি কেমন—
> সারা রাত ধরে দেখেছি স্বপন:
> ....স্বপ্নটা ভেঙে বাঁচলেম, দিদি।'

এবার ক্ষীরির শিক্ষা সমাপ্ত হল, সে রাণী কল্যাণীর পায়ে পড়ে বলল,

> 'একটুখানি বস দিদি, পদধূলি লব
> তুমি রাণী; আমি চিরদাসী তব।'

ওটা feudalism-এর আত্মসমর্পণ নয়, ও হল মন্দের ওপর মঙ্গলের জয়। পৃথিবীর সব লোক-কথা রূপ-কথার যে একমাত্র নীতিশিক্ষা। আমার মনে হয় বাংলা শিশুসাহিত্যে লক্ষ্মীর পরীক্ষার মতো নাটক নেই। এমন অপূর্ব মৌলিক রূপকথাও নেই। এতে রস-রচনার সব গুণ, রূপ-কথার সব গুণ আছে। কিনি-বিনি-কাশী ছাড়া কোনো শিশুচরিত্র নেই, রূপ-কথাতেও কদাচিৎ থাকে। ছোটরা প্রতিটি পংক্তি উপভোগ করে। নীতি-শিক্ষাটি এমন সুচারু ও শিল্পসংগত উপায়ে উপস্থাপিত হয়েছে যে কথামালার নীতিশিক্ষার চেয়ে একটুও কম প্রকট নয়, অথচ শতগুণ মধুর। রূপকথা এমনি হওয়াই উচিত। অতি সহজে মঞ্চস্থ করা যায়। এমনি রসে ভরপুর যে পড়তেও মজা, অভিনয় করতেও কোনো অসুবিধা হয় না। এমন চমৎকার ছোটদের নাটক বাংলায় আর দেখলাম না।





যৌবনে রবীন্দ্রনাথ



রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি

ক্ষুদিরাম দাস

(কথিকা, আবৃত্তি, নৃত্য ও গীতের মধ্যস্থতায় পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র-আলেখ্য)



উদ্বোধন-সংগীত

ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর-মাঝে।

ইত্যাদি—

'আকাশ-ভরা সূর্য-তারা' ইত্যাদি—

হিমাদ্রি-গুহা থেকে নির্ঝর-ধারা নেমে এসে প্লাবিত করেছে বাংলা তথা ভারত। অভিষিক্ত করেছে দেশবাসীকে, চালিত করেছে মহাজীবনের অভিমুখে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য। পশ্চিম-উত্তর পূর্ব থেকে কালে কালে দলে দলে বিচিত্র মানুষের ভারতে অনুপ্রবেশ, মেশামেশি, বসবাস। ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র সবই জটিলভাবে বিমিশ্রিত মানুষ। অনার্য বাঙলা, কোল-মুন্ডী অধ্যুষিত আদিম বাঙলা আড়াই হাজার বছর আগে পশ্চিম ভারত থেকে আসা বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্র-শক্তির অধীন হয়, বহু আদিম অধিবাসীই সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষারীতি বরণ করে, পারস্পরিক রক্ত-বিমিশ্রণ ঘটে। কিন্তু মিশ্রিত হলেও বাঙলায় ও বাঙালীর জীবনধারায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বেশ কিছু থেকে যায়। আজও বাঙালীর সাহিত্যে শিল্পে, ধর্মে-রুচিতে-নিজস্বতা যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় আর্য বা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু প্রভাব, এবং সূফী ইসলাম অভিঘাত, আর পরিশেষে ইংরেজের সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের স্বাক্ষর।

এমনই এক সমন্বিত প্রতিষ্ঠাভূমিতে উন্নত সংস্কৃতি ও জীবনমানের আশ্রয়ে জন্ম নিলেন আমাদের মহাকবি তাঁর মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তা কল্পনা সঙ্গে নিয়ে, তাঁর জন্মগত সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের পরিবেশকে লঙ্ঘন করার মানসিক শক্তি নিয়ে। তিনি দেখালেন, ভারতবর্ষ কেবল আর্যদের ও ব্রাহ্মণদের দেশ নয়, মিলিত আর্য-অনার্যের, এমনকি পাঠান-মোগল-ইংরেজের সংস্কৃতি ও জীবনরীতির লীলাভূমি। বিচিত্র হয়েও সমন্বিত এক, আবার এক হয়েও বাইরে বহু বিচিত্র। সুতরাং ভারতে মানুষের জাতিবর্ণগত আত্যন্তিক বিভেদ কল্পনা অবাস্তব, অসংগত। এই মূল্যবান্ অনুভবটিকে কবি অবিস্মরণীয় ক'রে রেখে গেছেন তাঁর 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে' এই বিখ্যাত কাব্য-গীতে। আজকের বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার অশুভ মুহূর্তে এটি প্রারম্ভেই স্মরণ করা যাক্—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে"

কৈশোরে ও তারুণ্যে কবি অবিচ্ছিন্ন ভারত-ভক্তির উদ্গাতা। সাম্রাজ্যবাদী অপশাসনের সমালোচক। উত্তর-যৌবনে তিনি বাঙলার মাটি ও বাঙালীর সুখে দুঃখে স্নিগ্ধ জীবনযাত্রায় সম্মোহিত, আবিষ্ট। তাই কার্জনী শাসন যেদিনে বাঙলার-বুকে ছুরি বসানো হ'ল, আর সারা বাঙলা হ'ল উত্তাল, কবি নীরব থাকতে পারলেন না, এক বৃন্তে দুই ফুল হিন্দু-মুসলিমের মিলনের রাখী হাতে নিয়ে শোভাযাত্রায় অগ্রবর্তী হলেন—অন্যায়ভাবে বিভক্ত দুই বাঙলার অন্তরঙ্গ ঐক্যের সূচক সেই অক্ষয় গানটি কন্ঠে নিয়ে—

বাঙলার মাটি, বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক
হে ভগবান্।

ইত্যাদি

ভারতগত জাতীয়তায় কবির গৌরববোধ থাকলেও জন্মভূমির টান, সে যে নাড়ীর টান—মাটির টান, আত্মীয় মানুষের টান। তাই কবিচিত্ত এই মাতৃভমিরই বাউলের সুরে সুর মিলিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বারংবার গেয়ে

উঠেছে—'আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।। কবি পুন:পুন স্মরণ করেছেন বাঙলারূপিনী জননীর আলো, ছায়া, স্নেহ, মায়া, মাটি-জলের উচ্ছ্বসিত দানের নিবিড় আকর্ষণ। কল্পিত দেবতা তো দেবতা নয়, বাঙলার এই মাটিই হ'ল প্রত্যক্ষ দেবতা, তাই তাঁরি পায়ে কবি তাঁর গানের অর্ঘ্য উৎসর্গ ক'রে ধন্য হতে চেয়েছেন—

ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।।

কবির কাছে বঙ্গজননীর অপরূপ—ঐশ্বর্যের মধ্যেই বিশ্বের সব কিছু ধরা দিয়েছে। তাই এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছে কবি-মন। এর বর্ষা-শরৎ-বসন্তের বিচিত্র রূপসজ্জায় বিমুগ্ধ কবিপ্রাণ থেকে' আমরা পেয়েছি অজস্র গান। তিনিই আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন রূঢ় জীবনযাত্রা থেকে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের দিকে, স্বপ্নের মায়াঞ্জন পরিয়ে দিয়েছেন দৃষ্টিহীন চোখে। প্রকৃতির স্পর্শে যে এত মাধুর্য, এত প্রাপ্তি, তা ভুলেই এতদিন দিন কাটিয়েছিলাম গতানুগতিক আমরা। সহসা আসে আষাঢ়, দেখা দেয় মহাসমারোহে নবীন মেঘকজ্জ্বল স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার ক'রে। তপ্ত ধরণীকে বর্ষণে শীতল ও ভাবী ফসলের সম্ভাবনায় পরিতৃপ্ত ক'রে। বিস্মিত রোমাঞ্চিত কবি প্রত্যক্ষ করেন তপ্ত নিদাঘকে বিনির্জিত ক'রে গুরুগুরু মাদল বাজিয়ে যে রাজ-অতিথি সহসা এসে পড়েছে সে ভীষণে-মধুরে দ্বৈতরূপ, সে অনির্বচনীয়। মূর্তিতে নয়ন-লোভন, আশ্বাসে স্নিগ্ধকান্ত কমনীয়, অথচ প্রকাশে অশনি-বন্যায় সে ভয়ংকর। এই নবাগত অতিথিকে কবি অভ্যর্থনা করলেন বাঙলারই একান্ত আপন বাউল নৃত্যগীতের অর্ঘ্যে।—

বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা।
ইত্যাদি

সব শঙ্কা সংশয় জয় ক'রে নববর্ষার উল্লাস বাঙলার নরনারীকে কিভাবে রসাবিষ্ট করে তার পরিচয় রাখলেন আরও বহু কবিতায়ও গানে—

নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে।
নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
[আবৃত্তি]

অতএব আর দেরী নয়, এসো নবীনা, এসো অন্ত:পুরিকা, নববর্ষার পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত হয়ে বর্ষার আবাহন সার্থক ক'রে তোল। কেতকী-কেশরে কেশপাশ করো সুরভি। ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী। কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে। অঞ্জন আঁকো নয়নে। দেখো, গৃহকোণে স্বার্থনিমগ্ন থেকে ব্যর্থ না হয় পরমবন্ধুর এই আগমন—

এসো নীপবনে, ছায়াবীথি তলে, এসো করো স্নান
নবধারা জলে, এসো ....।

ক্রমে শেষ হ'ল ছন্দে নিয়মিত বর্ষণের পালা। ফিরে যেতে হ'ল অতিথিকে কবি-প্রদত্ত উপচার নিয়ে, অশ্রুতে-হাসিতে মেশা শেষ বর্ষণের চিহ্ন রেখে। আকাশে শুভ্র খন্ড মেঘের পাল তুলে আর ধরণীতে শিউলির অঞ্জলি ছড়িয়ে স্মিত হাস্যে দেখা দিলে রমণীয় শরৎ—বাঙলার সরল স্বচ্ছ প্রাণের প্রতীক—আর এক নূতন অতিথি—যার উচ্ছ্বসিত আবাহনী গাইতে কবি বিলম্ব করলেন না।—

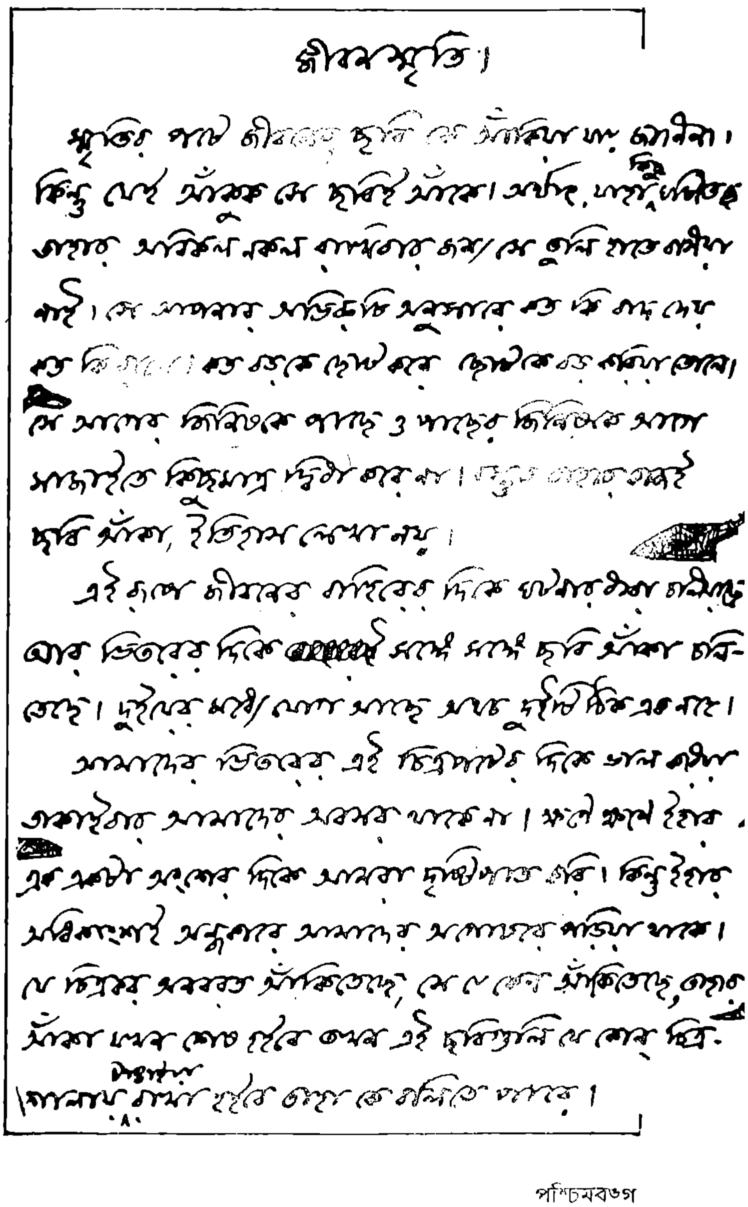
শরতে আজ কোন্ অতিথি এল তোমার দ্বারে।
আনন্দগান গারে হৃদয়, আনন্দগান গারে।।

হেমন্ত শীতের প্রাচুর্যের সঙ্গে দেহমনের জড়তার আবেশটাকে নি:শেষে হটিয়ে দিয়ে এল ফাল্গুন, সঙ্গে নিয়ে এল বিহ্বল চঞ্চল অজস্র রঙের বৈচিত্র্য। সহসা অশোক-পলাশের রক্তচ্ছটায় দিগন্ত লাল হয়ে উঠল, আম্রমঞ্জরীর সুবাস-মাখানো দক্ষিণ সমীর গ্রাম-পথে-পথে উদাসী ক'রে তুললে পথিককে। দেখা গেল কুহেলীর পর্দা সরিয়ে ঋতুর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছে কিসলয়ের উত্তরীয় জড়িয়ে নবযৌবনের অগ্রদূত। ভাববিহ্বল কবির চোখে ধরা পড়ল আসরে সাজবদল ক'রে এবার যে এসেছে সে সেই বৈপ্লবিক সুন্দর, সে বারে বারে নূতন, সে ফিরে ফিরে নূতন। তার আহ্বান চির নবীনের জাগরণের আহ্বান, জয়তু-নাশা নব আনন্দে আহ্বান। কবি মনে-প্রাণে-তা অনুভব ক'রে উচ্ছ্বসিত সুরে গেয়ে উঠলেন—

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে।
জলে জলে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় রে
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিন আকাশ, গানে নিখিল উদাস,
যেন চল চঞ্চল নব পল্লবদল মর্মরে মোর মনে মনে।

[Dance with music]

ধূলামাটির পৃথিবীতে, কাজের জীবনে স্বপ্নসম নূতনের এই আবির্ভাব। বিষয়কর্মে জড়িত উদাসীন আমরা বুঝতেই পারিনা কখন শীতের অন্তে কুহেলিকার আবরণ অপসৃত হ'ল, কখনই বা গৈরিক উত্তরীয়-পরা


জীবনস্মৃতি।

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয় কত কি রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে ও পাছের জিনিষকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এই রূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুইয়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দুই ঠিক এক নহে।

আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্র-শালায় টাঙাইবার জন্য হইবে তাহা কে বলিতে পারে।

চিরনবীন তার আগমন-সংকেত জানিয়ে দিলে। যখন মোহাবেশ কাটে, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ি। আমাদের এই মনোভাব ফুটে উঠেছে কবির লেখা এই গানটিতে—

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক,
আমি দেখি নাই তোমারে।

কিন্তু বর্ষা-বসন্ত কি কেবল মিলনের, নিছক আনন্দ-উল্লাসের? দু:খবেদনার ভূমিকা না থাকলে কোনো আনন্দই তো সম্পূর্ণ নয়। কবি অনুভব করেন, মর্ত্যবাসী আমাদের মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে বিরহ, পাওয়ার মধ্যে জেগে থাকে হারানোর শঙ্কা। আর বিরহ-পারাবারের শেষ নেই যখন মনে হয় তখন চকিতে বাজে মিলনের বাঁশি, নবীন ফাল্গুনের দিন বহন ক'রে নিয়ে আসে মিলনের অপূর্বতা। নিসর্গের এক চোখে বিনিদ্র জাগরণ, অন্য চোখে প্রমুদিত বিহ্বলতা। স্বভাবে চিরবিরহী কবি তাই বিরহকে বিশেষ মূল্য দিয়ে তবেই প্রেমকে অভ্যর্থনা জানালেন বসন্তে—

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথে এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে।।

ঋতু-পর্যায়ের বিদায়-গীতি-গ্রন্থনের মধ্যে অনিবার্য বিরহ-বিষাদের ছোঁওয়া লেগেছে। কবি দেখেছেন বাঙলার ঋতুগুলির এক এক পর্যায়ে এক একরাশ কুসুমবিকাশ, আর তার চিহ্ন মুছে মুছে এক অদৃশ্য চঞ্চলের অলক্ষিত গতায়াত—

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে।।

কিন্তু আশ্চর্য অসাধারণ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন আমাদের এই মহাকবি। তিনি কেবল নিসর্গের রম্যতারই অনুরঞ্জক ছিলেন না, ছিলেন সমাজ-জীবনেরও একনিষ্ঠ শিল্পী, ছিলেন নিগৃহীত সাধারণ মানুষের বেদনার কবি, ছিলেন সাম্যবাদী বিপ্লবের বাণীবাহক।

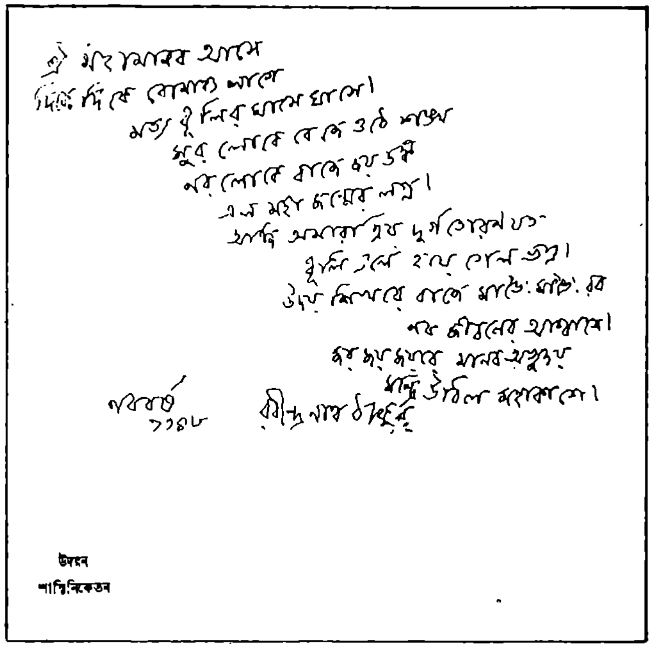
তাই সুন্দরের অলক্ষিত চরণ ধ্বনি শুনতে শুনতে কবি সংবাদ পান যে ঋতু-পর্যায়ের সূত্রে সমাজে ও রাষ্ট্রে বারংবার নূতনের আবির্ভাবই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সংকেত। পুরানোকে জরাজীর্ণকে ভেঙে চুরমার ক'রে দুর্জয় নূতনের জয়যাত্রা চলেছে। কেবল নিসর্গে নয়, মানবসমাজেও। কৌশল অর্জিত স্বত্ব আঁকড়ে রক্ষণশীলদের নিশ্চিন্ত ভোগবাসনার আগ্রহ কবির প্রবল ধিক্কারের বিষয় হয়েছে। বসন্তের বোধন-গীতের মধ্যে কবি এই সত্যকে অনায়াস এবং সোচ্চার প্রকাশ দিয়েছেন।

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে নব পরিচয় দিতে।
নবীন রূপের অপরূপ যাদু আনিবে সে ধরণীতে।।
...বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাঁহার, সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা।।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার পরশপাথর হাতে আছে তার,
তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা।
বলো জয় জয়, বলো নাহি নয়, কালের প্রয়াণ পথে
আসে নির্দয় নবযৌবনের ভাঙনের মহারথে।।

(আবৃত্তি)

চির-তারুণ্যের কণ্ঠেই কবি পরিয়ে দিয়েছেন বিজয়ীর জয়মাল্য। রক্ষণশীল সংস্কারসহ যাবতীয় সঞ্চয় শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ হয়ে মানবতাকে পীড়িত করে তখন প্রাণের মুক্তিকামী কবি চান বিপ্লব, চান সমাজ-পরিবর্তন। রক্তকরবী নাটকে শৃঙ্খলিত মজদুরদের প্রাণের মুক্তি তিনি এইভাবেই দেখিয়েছেন। আর জাতীয় ধর্মান্ধতা এবং প্রথাপালনের নির্দেশের মধ্য দিয়ে এদেশে মানুষকে যেভাবে নিশ্চল নির্জীব ক'রে রাখা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কবি বিদ্রোহ করেছেন অজস্র প্রবন্ধে-নাটকে-কবিতায় ও গানে গানে।

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।।


ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।
১ বৈশাখ ১৩৪৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

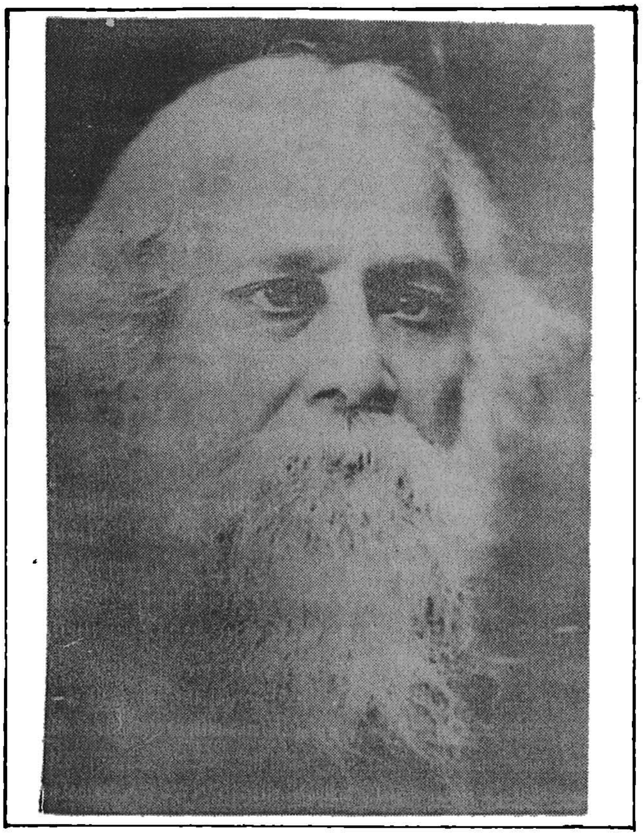
উদয়ন
শান্তিনিকেতন

মিথ্যা শাস্ত্র এবং জঘন্য আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিবর্ণ—সম্প্রদায়-ভেদই আমাদের দেশে শ্রেণীশোষণের কৌশলের রূপ নিয়েছে, আর এই অসত্যের জোরে সমাজ কোটি কোটি মানুষকে প্রায় পশু-শ্রেণীতে ফেলে রেখেছে হাজার হাজার বছর ধ'রে। এই ব্যাপারটা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের থেকেও বড় শত্রু ব'লে কবির মনে হয়েছে। তাই সজোরে আঘাত দিয়ে এই বাঁধনটাকেই চুরমার করার জন্য রুদ্রমূর্তি কবি তরুণদের আহ্বান করেছেন—

ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক্, যাক্ ভেসে যাক্, যাক্ ভেসে যাক্

এই ভাঙগানে এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর আবাহনে কবির বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ যে নেই, তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী নাটকেও। বিশেষে কবি এখন এই সত্যের দ্বারা চালিত হয়েছেন যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনধারার মধ্যে মৃত্যু ব'লে গুরুতর ছেদ কিছু নেই। মৃত্যু মহাজীবনের অংশমাত্র। পরমাণু বিজ্ঞানের দ্বারা চালিত হয়ে কবি ধ্বংস ও সৃষ্টির পর্যায়ক্রমে আবর্তন লক্ষ্য করেছেন, মহাকাশের নক্ষত্রনীহারিকায়, তথা আমাদের এই ক্ষুদ্র-বিশ্বেও। আবর্তন-বিবর্তনের চক্রচারণে সতত স্পন্দিত সূর্য-নক্ষত্রনীহারিকার দেশকাল-মিলিত পরিস্থিতিকে বিস্ময়ে বন্দনা করেছেন কবি। আর করেছেন নটরাজের কল্পনা, যার নৃত্যচ্ছন্দের মধ্যে এক পদক্ষেপে ঘটছে মৃত্যু, অন্য পদক্ষেপে সূচনা হচ্ছে আনন্দময় জীবনের। অতএব পুরানো জীর্ণ শাস্ত্রপ্রথার সংস্কার এবং সুখ স্বার্থের আবিলতা বর্জন ক'রে সন্ন্যাসী ও সুন্দর এই নটরাজের অনুবর্তী হতে হবে। এই নির্দেশই দিয়েছেন কবি তাঁর বিখ্যাত নটরাজ-বিষয়ক কাব্য-গীতে।

নৃত্যের তালে, তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।.....
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।
তোমার চরণ পবন পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে।
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে।



অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রবলতম বিদ্রোহের অধিকার নিয়ে জন্মেছিলেন কবি। কেবল সৌন্দর্য ও নিরুদ্দেশ সুদূরের স্বপ্নে বিলীন কাব্যিক জীবন যাপন করতে চান নি। যেমন কুসংস্কারের ভারে স্থবির ও ভেদবুদ্ধিসম্বল জাতীয় জীবনের জড়ত্বের উপর তীব্র আঘাত হেনেছেন, তেমনি সাম্রাজ্যবাদীদের অপশাসনকে ধিক্কার দিয়ে দেশবাসীকে উৎসাহিত করেছেন নির্ভীক আচরণে, সংগ্রামী সাহসিকতায়। আমাদের প্রগতির পথে অভয়বাণীর প্রেরণা কবির এক অসামান্য দান। মনে করুন শিক্ষাগুরু গোবিন্দের মুখ দিয়ে উচ্চারিত কবির সেই বীরবাণী—

কিসের বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ,
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান
অমর মরণ রক্তচরণ নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

আর শ্রীঅরবিন্দের প্রশস্তিতে লিখিত অমর সঞ্জীবনী বাক্য—

ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্বভয়
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদন্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোল তোল শির,
তুমি আছ, আমি আছি, সত্য আছে স্থির।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়কার স্বাধীনতা অর্জনের সেই উদ্‌যোগ মুহূর্তে স্মরণ করুন। স্মরণ করুন এবার তোর—মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা ব'লে ভাসা তরী। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'। আর স্নেহনীড়ে পালিত স্বভাবে ভীরু বঙ্গসন্তানদের কানে কবির সেই অভয়মন্ত্র—

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।।

কবি যখন লেখনী স্তব্ধ রেখে মাটি-সংলগ্ন নি:সম্বল নিরক্ষর মানুষের উন্নয়নে ব্যাপৃত এমন সময় ইয়োয়োপে দেখা দিলে বণিক্‌ধর্মী সাম্রাজ্য বাদীদের অন্ত:সংঘাত—প্রথম মহাযুদ্ধ। একে উপলক্ষ ক'রে কবি উধাও হলেন বিপ্লবী প্রগতির মুখে। ইংরেজ-পদলেহী শিক্ষিতদের নিশ্চিত মানসিকতাকে ধিক্কার দিয়ে জাগানোর প্রয়াস নিলেন—দূর হতে কী শুনিস্ মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, ওরে উদাসীন। এই তো রাষ্ট্রে-সমাজে পালাবদলের শুভক্ষণ। আর আরামের স্বপ্ন নয়, এখন আমাদের অবহেলিত অগণিত মানুষকে সংগঠিত করতে হবে, সেই সংগ্রামের শরিক হও—

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব আঘাত খেয়ে অচল রব।
বক্ষে মম দু:খে তব বাজবে জয়ডঙ্কা।
দেব সকল শক্তি লব অভয় তব শঙ্কা।।

বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে অভিযাত্রী তরুণদের সাহসিকতা অক্ষুণ্ন রাখতে শোনালেন—

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী।....
ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক, নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ—
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা, পলে পলে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

[আবৃত্তি]

একই সঙ্গে কবি চাইলেন সামন্ততান্ত্রিক নিষ্পেষণ থেকে এদেশের অসহায় নারীর মুক্তি। কবি এখন পূর্ণমাত্রায় বিপ্লবী, ভাঙনের অগ্রদূত, রুদ্রমূর্তি। নিরুদ্দেশ অজানার পথে মরণপণ ক'রে ছুটে চলার নেশায় কবি এখন অধীন, সংগ্রামেই তাঁর অপরিসীম আনন্দ আর তাই সঞ্চারিত করতে চান তরুণদের প্রাণে—

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বোস্ রে সবাই, টান রে সবাই টান।।

নিসর্গের কবি রবীন্দ্রনাথ, সমাজ-পরিবর্তনের সৈনিক রবীন্দ্রনাথ, আবার সর্বহারা কৃষক-শ্রমিকের বেদনায় কাতর একাধারে কর্মী ও কবি রবীন্দ্রনাথ। কবির নিসর্গ-স্বপ্নে প্রথম বাধা এল যখন জমিদারির তদারকে গিয়ে পূর্ব-উত্তরবঙ্গের মাটি-সংলগ্ন কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের অপরিসীম দৈন্য স্বচক্ষে দেখলেন। এরা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই লোক-কবির কাছে শুধু শোষিত মানুষ। কবি দেখলেন, এরা যে অন্ন উৎপাদন করে, সে অন্নে এদের অধিকার নেই বললেই চলে। অন্ন কেড়ে নিচ্ছে নায়েব-গোমস্তা, কেড়ে নিচ্ছে জোতদার-মহাজন। সতত নি:সম্বল, ঋণভারগ্রস্ত, অহরহ সংসারের পোষণের চিন্তায় জর্জরিত, তার উপর নিরক্ষর, সুতরাং নির্বাক। এদের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল দৈব। মানুষের সপক্ষে কবিচিত্তের সেই যে প্রথম জাগরণ ঘটল তার অভিঘাত শেষ জীবন পর্যন্ত কবিকে ব্যাকুলিত করেছে। কবি এদের অবর্ণনীয় দু:খের অবস্থার বর্ণনায় লিখলেন—

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির,
মূক সবে,-ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহে চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার —
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি;
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ ....

আর এই সঙ্গে অগণিত মানুষের এরকম অভিশপ্ত অবস্থার সৃষ্টিতে জাতীয় বিপদের সম্ভাবনা ঘোষণা ক'রে শিক্ষিত অভিজাতদের দৃষ্টি এই সর্বহারাদের দিকে ফেরাতে চাইলেন—

ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা।

কিন্তু শ্রেণীস্বার্থে নিমগ্ন শিক্ষিত নাগরিকেরা কবির আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। তখন কবি নিজেই কতিপয় সঙ্গী নিয়ে কিসান—উন্নয়নে লেগে পড়লেন। কবিজীবনের সে এক অনন্য ইতিহাস। উত্তরজীবনে শ্রীনিকেতনে এই ইতিহাসেরই অনুবৃত্তি করেছিলেন তিনি। মাটি ও কৃষকের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর আবেদন নিয়ে গেয়েছিলেন—

ফিরে চল্ মাটির টানে।
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।।

চাষের কাজে যে অমর্যাদা নাই, বরং গৌরব রয়েছে এ বিষয়টি প্রতিপন্ন করেছিলেন নিজহাতে হলকর্ষণ ক'রে। আর সেই সঙ্গে কিসানের ভূমিকা নিয়ে কৃষিকাজে আনন্দের বিষয় ব্যক্ত করলেন গানের মধ্য দিয়ে—

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।।

নি:সম্বল নিরক্ষর কৃষক ও মেহনতী মানুষের জীবনের শরিক হতে পারেন নি ব'লে কবি তাঁর শেষ জীবনে বারংবার আক্ষেপ করেছেন এবং কায়মনোবাক্যে কামনা করেছেন এদের জীবনের যথাযথ সুখদু:খকে এদের মর্মের বেদনাকে ছন্দে গেঁথে ও নাট্যীকৃত ক'রে কথঞ্চিত সাহিত্যিক আনন্দের পরিবেশন করতে পারবেন এমন কবির আবির্ভাব হোক। কারণ, তিনি লক্ষ্য করেছেন, যে ভাবের আনন্দ থেকেও এরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। মহাকবি আক্ষেপসহ অকপটে তাঁর দৈন্য ব্যক্ত করেছেন যে তিনি পারেন নি, আর সেই সঙ্গে এদের জীবনের ভাবী কবিকে তিনি বারংবার নমস্কার জানিয়ে গেছেন—

এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদন যত করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে তপ্ত নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।....
মূক যারা দু:খে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি....
আমি বারংবার, তোমারে কবির নমস্কার।

কি উদারতা, কী অপার মমতা ও করুণা।

দেখা যায় শেষ জীবনে কবি তাঁর শিক্ষা ও আভিজাত্যের কোন মোহই রাখতে চান নি। নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য ব'লে কোটি কোটি মানুষকে যেভাবে অবজ্ঞাত-অপমানিত ক'রে রাখা হয়েছে, তা নিয়ে বহু প্রবন্ধ, কবিতা, নাটকে বহু পূর্ব থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন, যেমন 'অপমান' নাম বিখ্যাত কবিতায়, যার স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিগুলি আপনাদের অনেকেরই মনে থাকতে পারে, যেমন সেই—

[আবৃত্তি]

মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

শেষ জীবনে কবি নিজে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও অভিজাতের দলীয় ব'লে আক্ষেপ জানিয়েছেন, আর একটি স্মরণীয় কবিতায় অন্ত্যজ হিন্দু ও মুসলমান বাউল কবিদের সঙ্গে তাঁর সামাজিক ও মানসিক একাত্মতা



ঘোষণা করেছেন। কবিতাটি সকলের অবশ্য পাঠ্য। কবি বলেছেন—

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দির দ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর জনার মিলন-বিরহের গহন বেদনায়।

কবি আমি ওদের দলে—

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।

কবি এতে স্পষ্টাক্ষরে জানালেন, তাঁর মন্ত্র নেই শাস্ত্রকল্পিত দেবতা তাঁর দেবতা নয়। যিনি নিসর্গের মধ্যে পরিবর্তমান, ভেদচিহ্নহীন সকল মানুষের মধ্যে মহামানব সত্তারূপে নিজেকে অহরহ প্রকাশ করেন, তিনিই তাঁর উপাস্য।

কবিজীবনের একটি উল্লেখ্য ঘটনা তাঁর সোভিয়েত পরিদর্শন। নিজ আন্তরিক ব্যাকুলতার তাগিদেই সেখানে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের ব্যাপক উদ্‌যোগ অধ্যয়ন করতে গিয়েছিলেন বার্ধক্যকে অগ্রাহ্য ক'রে। গিয়ে যা দেখলেন তাতে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁর যাত্রাকে তীর্থযাত্রা ব'লে তিনি অভিহিত করলেন। তিনি স্বদেশে নিরক্ষর কৃষক-শ্রমিকদের উন্নয়নে যে

সীমিত উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন, ওখানে গিয়ে দেখলেন তারই ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিক প্রসার। সব দেখে কবি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলেন এবং তাঁর বিস্ময়কে কয়েকটি চিঠিতে লিপিবদ্ধ ক'রে জানালেন—যে চিঠিগুলির পুস্তক আকারে নাম—রাশিয়ার চিঠি। যতদিন আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিকাশ না আসে ততদিন 'রাশিয়ার চিঠি' আমাদের স্মরনীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে।

আমরা মনে করি, জীবন-দীপ নির্বাপিত হবার আগে আমাদের নিসর্গ ও মানুষদরদী মহাকবি বিশ্বের ও স্বদেশের পরিস্থিতিতে শান্তি অনুভব ক'রে যেতে পারেন নি। স্বদেশে ইংরেজের পুলিসী শাসনের উগ্রতার বেড়েই চলেছিল। মুক্তির সুনিশ্চিত আভাসও তিনি পান নি, কারণ, হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হয় নি। এই কণ্টক সমাজদর্শী কবিকে আগাগোড়াই বিদ্ধ করেছে। তারপর এই সময় কারাগারে বন্দী তরুণদের উপর উৎপীড়ন। হিজলী জেলে আটক কয়েকটি তরুণকে হত্যার ব্যাপারে কবি ভীষণভাবে মর্মাহত হয়ে মনুমেন্টের নীচে দাঁড়িয়ে এর প্রতিবাদ করেছিলেন, আর এতই আঘাত বোধ করেছিলেন যে মহাপুরুষদের কণ্ঠে বারংবার কথিত শান্তি ও অহিংসার বাণীতে আস্থা রাখতে পারেন।

ভগবান। তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে,
দয়াহীন সংসারে।
তারা ব'লে গেল, ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো,
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।
স্মরণীয় তারা, বরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু, তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।।

[আবৃত্তি]

মনে পড়ে এরই বারো বছর আগে নৃশংস জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডে বিক্ষুব্ধ কবিকে ইংরেজ-প্রদত্ত 'স্যার' খেতাব কি ভাবে ঘৃণাসহকারে বর্জন করতে হয়।

পৃথিবী-সম্পর্কের শেষ দিনগুলিতে নিসর্গের মহিমা থেকে মানুষের নিগ্রহ এবং মানুষের মুক্তির উপায়ই জাগরণে স্বপ্নে কবিকে বিশেষভাবে বিচলিত ও অবশিষ্ট ক'রে রেখেছিল। কবি আশ্বস্ত শান্তচিত্তে বিদায় নিয়ে যেতে পারেন নি। ইয়োরোপে ও চীনে ফ্যাসিস্ট যুবরাজদের শিশুঘাতী নরঘাতী জঘন্য ভূমিকা তাঁকে কয়েক বৎসর ধরেই বিচলিত ও প্রতিবাদী ক'রে রেখেছিল। এই বয়সে তাঁকে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধে বিবেকী ও নির্যাতিত মানুষকে উৎসাহিত করতে দেখা গেল।

কবির এই শেষ সংগ্রামী আহ্বান।

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস।
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই—
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে।
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

[আবৃত্তি]

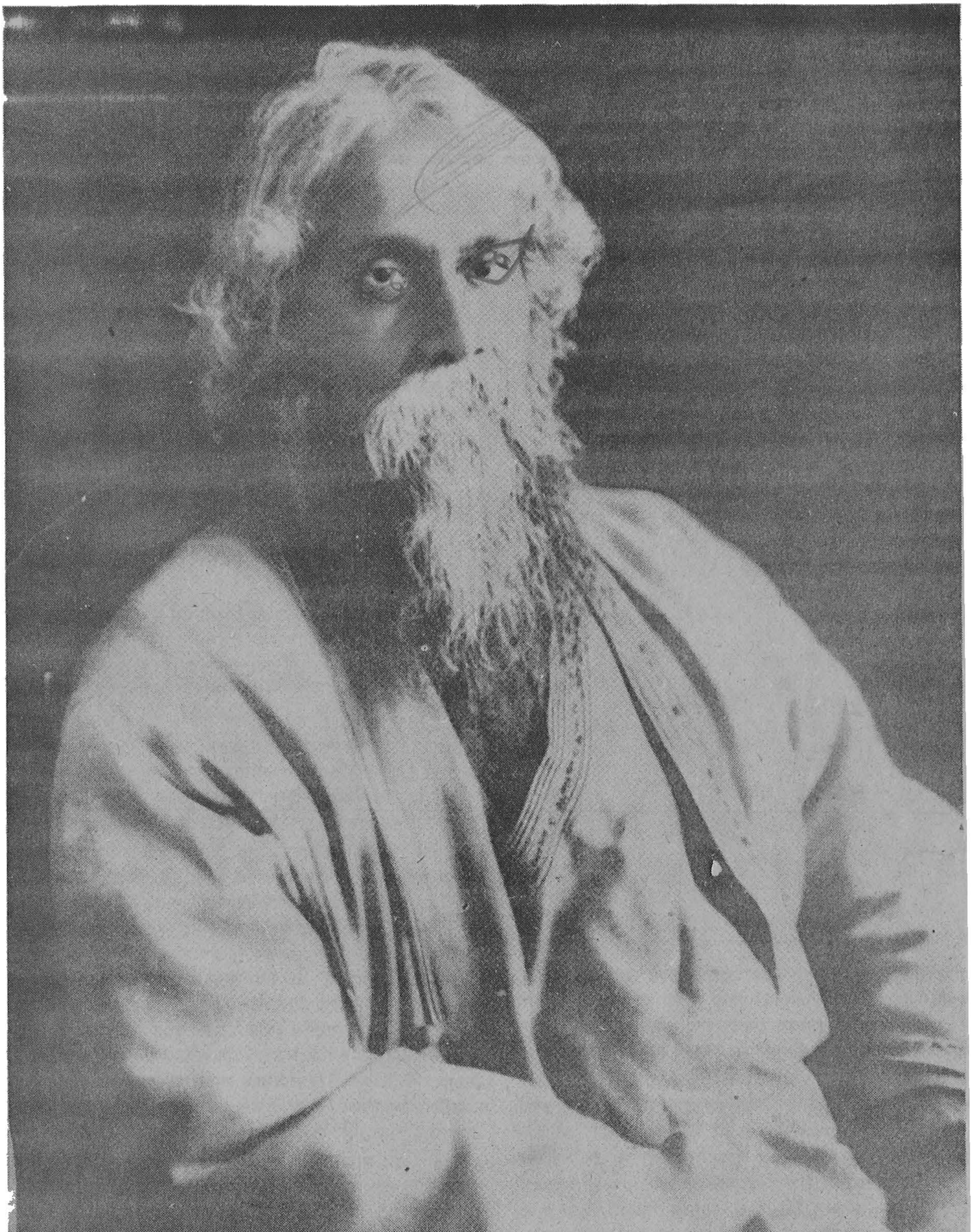
কিন্তু বার্ধক্যেও কবি সেই দৃপ্ত যৌবনমূর্তি। বিস্ময়ে, মরি বিস্ময়ে। কিন্তু আরও আছে। সে হ'ল অন্যায়ের চির-প্রতিবাদী কবির ইংরেজের অপশাসনের বিরুদ্ধে শেষ প্রতিবাদ, তাঁর মৃত্যুর ঠিক দু'মাস আগে। ইংরেজের সুশাসন ও ভারতবাসীর অকৃতজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে পন্ডিত নেহরুকে লেখা ব্রিট্রিশ এম পি র‍্যার্থবোনের লেখা চিঠি। পন্ডিতজী তখন জেলে। কবি সেই চিঠির বক্তব্য জেনে আর স্থির থাকতে পারেন নি। নিজে তার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন।

বিশ্বে ও স্বদেশে এসব অশান্তির কারণ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ইতিহাস ও মহাকালের ইঙ্গিতে স্থির-বিশ্বাসী কবি তাঁর অন্তরের নিভৃত প্রদেশে বোধ করি একটা স্থির বিশ্বাস রাখতেন যে দুঃখ দুর্যোগের অমানিশা শেষে অভিযাত্রী মানুষের মুক্তি—প্রকৃত সমাজসাম্যে মানুষের প্রতিষ্ঠা আসবেই। বহু দুঃখ বহু বাধার মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত মানবসমাজের অগ্রগতির সেই অপ্রতিরোধ্য প্রগতির প্রত্যয় নিয়ে আসে। আসুন, আমরা মৃত্যুঞ্জয় মানুষের বিজয় ঘোষণাকারী কবির দেওয়া শেষ অভয়বাণী কন্ঠে নিয়ে কবিপ্রনাণ ও নবী বন্দনা শেষ করি—

ঐ মহামানব আসে। দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।

[সমাপ্তি-সংগীত - 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'

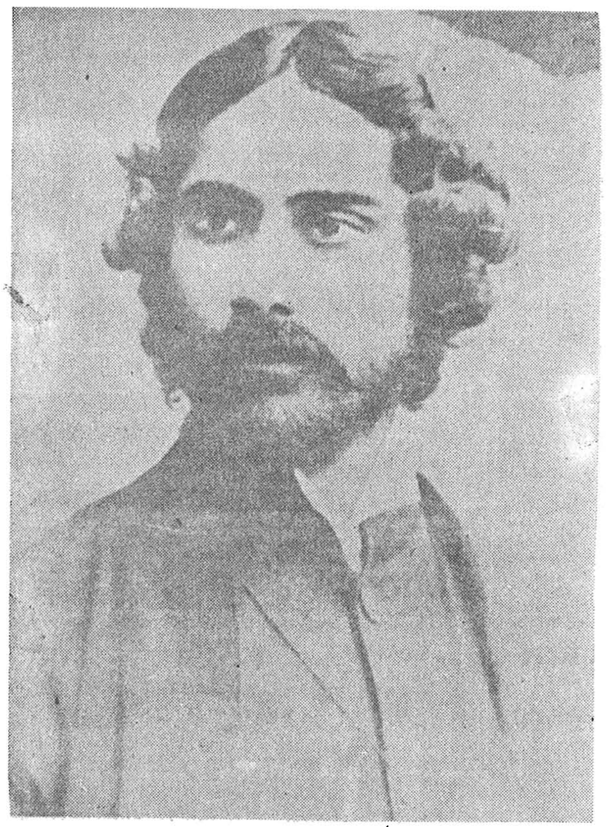






বাংলার নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথ

নেপাল মজুমদার



রামমোহনই ছিলেন বাংলার নবজাগরণের প্রকৃত হোতা, তিনিই এর প্রথম সূচনা করে যান। একদা রামমোহন, দ্বারকানাথ, ডিরোজিও, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলার নবজাগরণের যে সূচনা হয়, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই যেন আমরা তার পূর্ণ বিকাশ এবং একটা পরিণত রূপ দেখতে পাই।

বাংলার নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্থান ও ভূমিকার স্বরূপটি বুঝতে হলে আমাদের সমকালীন বিশ্বের এবং সেই সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস এবং তার মূল স্রোতোধারার বৈশিষ্ট্য ও গতিপথটিকেও জানতে এবং উপলব্ধি করতে হবে।

প্রসঙ্গত, একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ দরকার, ইউরোপের রেনেসাঁস ছিল সাধারণভাবে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী; পক্ষান্তরে বাংলার নবজাগরণের, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের যুগে, তা স্পষ্টতই বৈশ্বমানবিক এবং বৈজ্ঞানিক। বিশ্ব এবং মানুষ এবং মানবমুক্তি বলতে ইউরোপের মানুষকেই তাঁরা বুঝতেন। ইউরোপের বাইরে এশিয়া-আফ্রিকা নিয়ে পৃথিবীর বাকী অংশের এবং শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণকায় বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের মুক্তির বা মর্যাদার স্থান ছিল না তাঁদের চিন্তা ও চেতনায়।

.....'all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race' রামমোহনের মতো এমন করে তাঁর সমকালীন ইউরোপের মানুষ (দুই/চার জন মনীষীর কথা বাদ দিলে) একথা বলতে পারলেন না। শুধু ইউরোপের নয়,—ইউরোপের বাইরেও বাকি বিশ্বের কোনো জায়গা থেকে এমন কথা উচ্চারিত হলো না সেদিন।

বলা বাহুল্য, রামমোহনের এই বিশ্ববোধ ও মানব-চিন্তা রবীন্দ্রমানসে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে রামমোহনই ছিলেন আদর্শ পুরুষ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব' ও 'মানব' আরো অনেক বড়ো এবং বিরাট ও বিস্তৃত। রবীন্দ্রনাথের মানুষ অনন্ত শক্তিধর।

এই বিশ্ব ও মানব-চেতনাই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনার মূল প্রেরণা বা চালিকাশক্তি। এই আলো, এই চেতনাই তাঁর সর্বতোমুখী অতুলনীয় সৃষ্টিপ্রতিভাকে সর্বদিকে প্রসারিত করেছে। একটা সম্পূর্ণ অখন্ড বিরাট-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ, যেন দশটা রবীন্দ্রনাথ হয়ে দশদিকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ধাবিত হয়েছে—দশদিক আলোকিত করে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসী—সেই সঙ্গে তিনি বিশ্ববাসীও। তিনি বিশ্বনাগরিক—বিশ্বমানবকে যিনি নিয়তই হৃদয়ে ধারণ করে তাকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেছিলেন। মানুষের মিলনক্ষুধায় অস্থির হয়ে তিনি প্রায় সারা জীবনই দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তাঁর স্বদেশচিন্তায় যেমন স্বদেশের শক্তিলাভ ও মঙ্গলচিন্তা, তেমনি সারা বিশ্বের তথা সমগ্র মানুষের এবং মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বার্থচিন্তা স্থান পেয়েছে। রামমোহনের মতই তিনি পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার ধ্বংস কামনা করে গণতন্ত্রের বিজয়-কামনা করেছেন। রামমোহনের মতই তিনি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। কবি যেন যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা সমগ্র যুগের বেদনা ও যন্ত্রণায় অনুক্ষণ বিদ্ধ হয়ে যুদ্ধবাজ এই সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতির নিপাত জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই নির্ভীক ও যুক্তিনিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তার এবং চিত্তমুক্তির বাণীর জয়গান করেছেনঃ 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'। স্বদেশকে ভালোবেসে স্বদেশের বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ বিস্তর কবিতা ও গান রচনা করেছেন আবার সেই সঙ্গে মানুষের মহান আত্মশক্তির জয়গান করে মানববন্দনা করেছেনঃ 'আমি মানুষকে বিশ্বাস করি' 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—'ঐ মহামানব আসে'!

যুদ্ধবিধ্বস্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে বাংলার 'নবজাগরণে'র একটি মহান বাণীর অর্ঘ্য আছে, আর সে অর্ঘ্য রবীন্দ্রনাথ।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস-রিফর্মেশন-রেভল্যুশনের ধারা বেয়ে যে চিত্তমুক্তির এবং সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল, তারই প্রচণ্ড অভিঘাতে উনিশ শতকের বাংলার সুপ্তিভঙ্গের এবং নবজাগরণের প্রচণ্ড আকুতি দেখা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, রামমোহনই বাংলার এই নবজাগরণের প্রধান হোতা, তিনিই তার মহান সূচনা করেন। রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব এই, তিনিই ইতিহাসের এই অমোঘ নির্দেশ— এই মহান বাণীকে শুনতে পেয়ে তাকে আবাহন ও সকল দিকে উপবোধিত করার সূচনা করে গেলেন। রামমোহন চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি এবং আধুনিক ভারতেতিহাসে তাঁর বিশেষ ভূমিকাটি নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেনঃ 'আপনারা শুনিয়াছেন যে, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে রামমোহন জন্মলাভ করেন। ঐ বিপ্লবের যুগে যে বিশ্ববাণী ধ্বনিত হইতেছিল তাহা কেমন করিয়া শিশু রামমোহনের প্রাণ স্পর্শ করে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।.....'

'শিখরে যখন প্রথম আলোকসম্পাত হয়, তখন নিম্নভূমি গভীর অন্ধকারে আবৃত থাকে। বঙ্গভূমি যখন নানা কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার গভীরে অন্ধকারে আচ্ছন্ন তখন বালক রামমোহন অলৌকিকরূপে বিশ্ববোধের আলোক লাভ করিয়াছিলেন। এই জ্ঞানলাভের পক্ষে দেশ অনুকূল ছিল না, বরং সমস্তই তাঁহার প্রতিকূলে ছিল।.....'

[ভারতপথিক রামমোহন রায় পৃ-১৪৯]

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেনঃ

'রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল .....রামমোহনরায়ের সময়ে হিন্দুসমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সহস্র বাস্তু-অমঙ্গল উত্তরোত্তর পরিবর্ধমান বংশপরম্পরা লইয়া প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূলকায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র নাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধন অনুরাগবন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এইজন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্তনাদ করিয়া রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল।....'

কবি আরও বলিলেনঃ

[ভারতপথিক রামমোহন রায় পৃ-১১০]

'Rammohan Roy inaugurated the Modern Age in India.....He is the great path maker of this century who has removed ponderous obstacles that impeded our progress at every step, and initiated us into the present Era of world-wide cooperation of humanity.

'Rammohan was the only person in his time, in the whole world of man, to realize completely the significance of the Modern Age. He knew that the ideal of human civilization does not lie in the isolation of independence, but in the brotherhood of interdependence of individuals as well as of nations in all spheres of thought and activity.....

In social ethics he was an uncompromising interpreter of the truths of human relationship, tireless in his crusade against social wrongs and superstition, generous in his co-operation with any reformer both of this countryand of outside, who came to our aid in a genuine spirit of comradeship'...

[The Father of Modern India]

ইউরোপীয় সাহিত্যে রেনেসাঁসের আলো একদা কিভাবে বাংলার যুবচিত্তে আলোড়ন ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, কবি স্বয়ং তার বিবরণ দিতে গিয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখছেনঃ

'য়ুরোপে যখন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘুচিয়া গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপে রেনেসাঁসের যুগ আসিয়াছিল, শেকস্‌পীয়রের সমসাময়িককালের নাট্য-সাহিত্যে সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা।.....য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল।....

'ইংরেজি সাহিত্যে আর-একদিন যখন পোপ-এর কালের ঢিমেতেতালা বন্ধ হইয়া ফরাসি-বিপ্লবনৃত্যের ঝাঁপতালের পালা আরম্ভ হইল, বায়রন সেই সময়কার কবি। তাঁহার কাব্যেও সেই হৃদয়াবেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভালোমানুষ সমাজের ঘোমটাপরা হৃদয়টিকে, এই কনেবউকে, উতলা করিয়া তুলিয়াছিল।'

[জীবনস্মৃতি পৃ-১০১]

রবীন্দ্রনাথ যৌবনের প্রায় সূচনাতেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ হিন্দুধর্ম সংস্কারকদের বিরুদ্ধে নানা বিষয় নিয়ে বিস্তর তর্কযুদ্ধেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তবু পারিবারিক ধর্মসাধনা বা বিশ্বাসকে তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি। বস্তুত পারিবারিক অধ্যাত্মসাধনা অপেক্ষা তখনকার নিরীশ্বরবাদের প্রতিই যেন তাঁর আন্তরিক আকর্ষণটা বেশি ছিল। কবি স্বয়ং এ-সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতিতে' লিখছেনঃ

'তখনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেন্থাম মিল্‌ ও কোঁতের আধিপত্য। তাঁহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকেরা তখন তর্ক করিতেছিলেন।.....নাস্তিকতা আমাদের একটা নেশা ছিল।

'যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির উদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না— আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া মস্ত একটা আগুন জ্বালাইতেছিলাম।.....'

[জীবনস্মৃতি পৃ-১০৩]

বাংলার নবজাগরণে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন ও সেতুবন্ধনের প্রয়াসকে রবীন্দ্রনাথ যে চোখে দেখেছিলেনঃ

'অধুনাতনকালে, দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন।.....

'দক্ষিণ-ভারতে রানাডে পূর্ব-পশ্চিমের সেতুবন্ধনকার্যে জীবনযাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি, সেই মিলনতত্ত্ব রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল.....

'অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।.....তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

'একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল.....তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের

রাজপথকে আপন প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পরিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।'

[রবীন্দ্র রচনাবলী-১২'-শ খন্ড পৃ-২৬৫-৬৬]

ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ঃ

বাংলার 'নবজাগরণ'-এর সবচেয়ে বড়ো অবদান, আধুনিক যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিতে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের ধারার প্রবর্তন। রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ধারার নানা স্ববিরোধিতা এবং সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে তা অব্যাহত ছিল। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথই ছিলেন রামমোহনের যথার্থ উত্তরসূরী বা উত্তরসাধক। ভারতের আশু ও প্রধান লক্ষ্য, জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যই শুধু ভারতের অখন্ড জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজন নয়;—দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও মানবিকতাবাদী দৃষ্টিতে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের কর্মসূচী নিয়ে দেশ-নেতাদের এগিয়ে আসার জন্য রবীন্দ্রনাথ বারবার আবেদন জানিয়ে এসেছিলেন। 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের প্রাথমিক পরাজয়ের পর কবি তাঁর 'ব্যাধি ও প্রতিকার' শীর্ষক নিবন্ধে (১৩১৪) বললেন ঃ

'আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ—তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই।

'.....যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয়, তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ স্বজাতির স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনো দিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহার গতি নাই।'

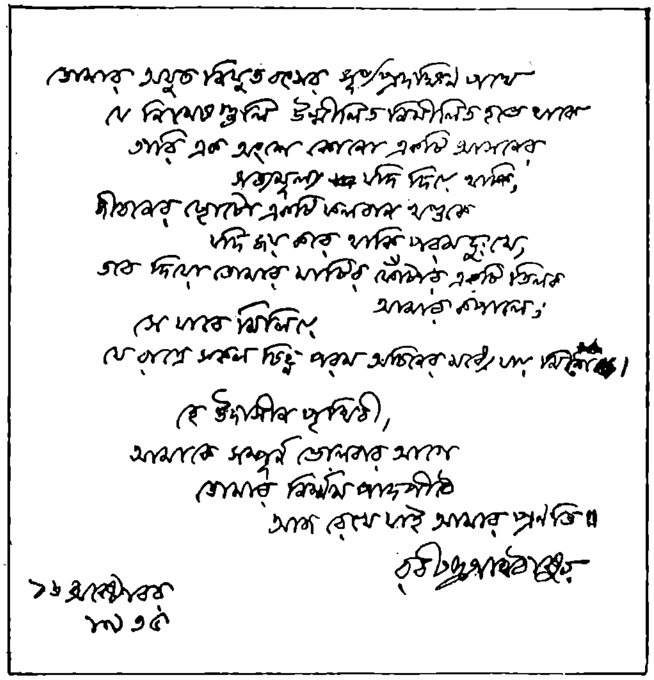
একদা ইউরোপে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও তামসিকতার গর্ভ হতে তার ধর্মসংস্কার আন্দোলন কিভাবে তার দেশে দেশে রাজনৈতিক চেতনা ও মুক্তির পথকে প্রশস্ত ও আলোকিত করে দেয় কবি তার উল্লেখ করতে বলেন ('কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—১৩২৪') ঃ

'সমাজে সকল বিভাগেই ধর্মতন্ত্রের শাসন একসময় য়ুরোপেও প্রবল ছিল। তারই বেড়া জালটাকে কাটিয়ে যখন বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লম্বা করিয়া পা ফেলিতে পারিল।....'

'আজ য়ুরোপের ছোটো-বড়ো যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে, সর্বত্রই ধর্মতন্ত্রের অন্ধ কর্তৃত্ব আলগা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। গণসমাজে যেখানে এই শ্রদ্ধা ছিল না, যেমন জার-কর্তার রাশিয়ায়, সেখানকার সমাজ বেওয়ারিস ক্ষেত্রের মতো নানা কর্তার কাঁটাগাছে জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছিল।.....'

আমাদের দেশে সেই সময় 'জাতীয় পুনরুজ্জীবন'-এর নামে যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে রক্ষা করার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, কবি তার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে এই নিবন্ধেই বললেন ঃ

'.....যত রাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া, মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়—যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করাই আমাদের গৌরবের কথা হয়—তবে সেই সঙ্গে একথাও বলিতে হয়, 'এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার জন্য দল বাঁধো'।.....'


তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারি এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে,
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক
আমার কপালে;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ অক্টোবর
১৯৩৫

সোভিয়েত গভর্নমেন্ট সেখানকার জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে যে অসাধারণ সাফল্যলাভ করেছিল সেটা রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিল। 'রাশিয়ার চিঠি'র এক জায়গায় কবি লিখছেন ঃ

'নিজের দেশের চাষীদের মজুরদের কথা মনে পড়ল। মনে হল, আরব্য উপন্যাসের যাদুকরের কীর্তি। বছর দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জনমজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধ সংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে; পরলোকের ভয়ে পাণ্ডাপুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারদের হাতে; যারা এদের জুতোপেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথাপদ্ধতির বদল হয়নি;.....। কটা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার অভ্রভেদী পাহাড় নাড়িয়ে দিলে যে কী করে, সে-কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বলো।.....'

বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযানকে মুক্তকন্ঠে প্রশংসা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন ঃ

'যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে; এতবড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেননা, যে-ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক না।.....'

'সোভিয়েটরা রুশসম্রাটকৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে।—অন্য দেশের ধার্মিকরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের' পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ায় কী প্রচন্ড নিষ্কৃতি হয়েছে, এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখতে পেতে।.....'

স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ ঃ

উনিশ শতকের বাংলার ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ, শিল্প ও সাহিত্য-সাধনা—এই ত্রয়ী সাধনার ধারা ঠাকুর পরিবারের মধ্যেই সবচেয়ে প্রবল এবং সার্থকভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। পারিবারিক এই বিশেষ আবহাওয়ার মধ্যেই রবীন্দ্রমানসে স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশচেতনা বিকশিত হয়েছিল। কবি এ-সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন ঃ

'.....আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।.....আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।'

নবগোপাল মিত্র এবং ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে সে-সময় যে 'হিন্দু মেলা'র প্রবর্তন হয়েছিল, সে-সম্পর্কে কবি লিখছেন,

'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সব ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।'

স্মরণ রাখা দরকার, এই 'হিন্দু মেলা' প্রাঙ্গণে বালক রবীন্দ্রনাথ (নবম ও একাদশ অধিবেশনে) স্বরচিত দুটি স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা পাঠ করেন। ১৮৭৭ খৃঃ হিন্দু মেলার একাদশ অধিবেশনে কবি তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি পাঠ করেন তার ধ্রুয়াটি ছিল ঃ

'ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা যে গায় গাক্ আমরা গাব না,
আমরা গাব না হরষ গান
এসো গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আর একতান'

স্মরণ রাখা দরকার, 'বঙ্গভঙ্গ' ও স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নেতৃত্বে সারা দেশে স্বদেশী-ভাবধারা ও স্বদেশপ্রেমের যেন জোয়ার এসেছিল। এই সময়ই রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'ও আমার দেশের মাটি', 'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি', 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'—প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত স্বদেশী সংগীতগুলি রচনা করেন।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'জনগণ মন অধিনায়ক' এবং 'আমার সোনার বাংলা' এই দুটি গান আজ ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশী সংগীতগুলি বাংলাদেশের জাগরণ ও বিস্ফোরণের, তাদের ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রামের গান হয়ে গিয়েছিল।

মাতৃভাষায় জনশিক্ষা সম্পর্কে ঃ

বাংলার 'নবজাগরণে'র পুরোধা ও প্রাণপুরুষেরা আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম মাতৃভাষার (অর্থাৎ বাংলা ভাষার) মাধ্যমে ব্যাপক জনশিক্ষার প্রসারের ওপর প্রধান গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা এবং অধিকারবোধের জন্যই এই শিক্ষার প্রয়োজন। যৌবনের সূচনাকালেই তাঁর বিখ্যাত 'ন্যাশনাল ফন্ড' প্রবন্ধে বললেন (ভারতী—কার্তিক ১২৯০)ঃ

'.....আমরা গবর্নমেন্টের কাছে ভিক্ষা মাগিতেছি কেন? এখনও আমাদের অধিকার জন্মে নাই বলিয়া অধিকার বিশেষের জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়া। যখন কেবল দুই চারিজন নয়, আমরা সমস্ত জাতি অধিকার বিশেষের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন কি আমরা ভিক্ষা চাহিব, তখন আমরা দাবী করিব, গভর্নমেন্টকে দিতেই হইবে।.....'

'তাহার এক উপায় আছে, বিদ্যাশিক্ষার প্রচার। আজ যে ভাবগুলি গুটি দুই তিন মাত্র লোক জানে, সেই ভাব সাধারণে যাহাতে প্রচার হয় তাহারই চেষ্টা করা, এমন করা, যাহাতে দেশের গাঁয়ে-গাঁয়ে পাড়ায়-পাড়ায়, নিদেন গুটিকতক করিয়া শিক্ষিতলোক পাওয়া যায় এবং আমাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরাজী শিখিলে কিংবা ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলে এইটি হয় না। ইংরাজীতে যাহা শিখিয়াছ, তাহা বাঙলায় প্রকাশ কর, বাঙালা সাহিত্য উন্নতিলাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গ বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সমদয় শিক্ষা বাঙালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজীতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না। তোমরা দুটি চারটি লোক ভয়ে ভয়ে ও কি কথা কহিতেছ? সমস্ত জাতিকে একবার দাবি করিতে শিখাও কিন্তু সে কেবল বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা হইবে—Political agitation-এর দ্বারা হইবে না।'

সর্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষা ঃ

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই সর্বজনীন শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু ১৯১০ মহাত্মা গোখলে যখন ইম্পীরিয়েল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে সর্বজনীন শিক্ষার জন্য বিল আনেন, তখন বাংলার এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তার বিরোধিতা করলে রবীন্দ্রনাথ খুবই ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন। কিছু দিন পর তিনি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখলেন ঃ ('শিক্ষার বাহন'—পৌষ ১৩২২)ঃ

'.....এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি, দেশের মধ্যে বাংলা দেশের কাছ হইতেই তিনি সবচেয়ে বাধা পাইয়াছেন'। বাংলা দেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছন ফিরিয়াছে।.....'

[শিক্ষা পৃ-১৮৭]

জনশিক্ষা নীতি সম্পর্কে ঃ

১৯৩০ সালে সোভিয়েত দেশ ভ্রমণে গিয়ে কবির চোখ খুলে যায়। সেখানকার জনশিক্ষার বিস্ময়কর বিস্তার ও সাফল্য দেখার পর বার বার উচ্ছাসিত প্রশংসা করেছেন। সে শিক্ষা শুধু অক্ষরজ্ঞান নয়—গোটা সমাজটার আগাগোড়া পরিবর্তন ঘটিয়েছে। রাশিয়ার চিঠি'তে এক জায়গায় কবি বলছেন ঃ

'.....রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল, আজ তারা সমাজের কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এত কালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন।.....'

আর এক জায়গায় কবি লিখছেন ঃ

'আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে। দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে।'.....

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অসঙ্গতি সম্পর্কে ঃ

ইউরোপীয় রেনেসাঁস-রিফর্মেশন-রেভল্যুশনের ঐতিহ্যধারার আলো কিভাবে আমাদের দেশে নবজাগরণের ও নবসৃষ্টির উন্মাদনা এনেছিল তারই স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন ঃ

.....আমরা যখন ইংরেজি সাহিত্যের সংস্রবে আসি তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। য়ুরোপে ফরাসি বিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া-ভাঙবার নাড়া। এইজন্যে দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বজনীনরূপে। সে যেন রসসৃষ্টির সার্বজনিক যজ্ঞ। তার মধ্যে সকল দেশেরই আগন্তুক অবাধে আনন্দভোগের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঠিক সেই সময়েই য়ুরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছল—তার মধ্যে ছিল সর্বমানবের মুক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরি হয়নি। সেই আনন্দে আমাদের মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এলো। সেই প্রেরণা আমাদেরও জাগ্রত মনকে পথনির্দেশ করলে বিশ্বের দিকে। .....'

'একদা ফরাসি বিপ্লবকে যাঁরা ক্রমে ক্রমে আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন বৈশ্বমানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ। ধর্মই হোক রাজশক্তিই হোক, যা-কিছু ক্ষমতালুব্ধ, যা-কিছু ছিল মানুষের মুক্তির অন্তরায়, তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান। সেই বিশ্বকল্যাণ-ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য সে মহৎ; সে মুক্তদ্বার সাহিত্য সকল দেশ সকল কালের মানুষের জন্য; সে এনে ছিল আলো, এনেছিল আশা।.....'

সেই ইউরোপে বিভিন্ন দেশে যখন স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট-বর্বরতার প্রকাশ পেতে থাকলো, তারই বেদনাদায়ক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বললেন ঃ

'.....রাষ্ট্রতন্ত্রে একদিন আমরা য়ুরোপকে জনসাধারণের মুক্তি-সাধনার তপোভূমি বলেই জানতুম—অকস্মাৎ দেখতে পাই সমস্ত যাচ্ছে বিপর্যস্ত হয়ে। সেখানে দেশে দেশে জনসাধারণের কণ্ঠে ও হাতে পায়ে শিকল দৃঢ় হয়ে উঠছে; হিংস্রতায় যাদের কোনো কুণ্ঠা নেই তারাই রাষ্ট্রনেতা।.....এই জন্যে বড়ো বড়ো শক্তিমান পাহারাওয়ালাদের কাছে দেশের লোক আপন স্বাধীনতা, আপন আত্মসম্মান বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। এমন-কি স্বজাতির চিরাগত সংস্কৃতিকে খর্ব হতে দেখেও শাসনতন্ত্রের বর্বরতাকে শিরোধার্য করে নিয়েছে।.....'

[সাহিত্যের স্বরূপ পৃ ২১-২৩]

ইউরোপ সম্পর্কে মোহভঙ্গের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তাঁর বিখ্যাত 'কালান্তর' শীর্ষক নিবন্ধের এক জায়গায় বললেন (১৯৩৩) ঃ

'ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মহলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনো দিন কোথাও হয় নি—এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে।.....'

'.....যে য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ ব'লে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজম-এর নির্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠসাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপ এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে।.....'

ইউরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে—সেই ইতালি ও জার্মানীতেই ফ্যাসিজমের দানবিক অভ্যুত্থানে কবি মর্মবেদনা ও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন ঃ

'পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালি যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কি রকম দুঃসহ নরকবাস সে কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মনি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো ক'রে দিয়ে এমন অকস্মাৎ এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হল না। যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চার দিকে উদ্ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। ...বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা?.....'

[কালান্তর পৃ ২১-২৪]

বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ঃ

বাংলার নবজাগরণ, শুধু বাংলার নয়,—তার একটা মহান বিশ্ববাণীও আছে। বাংলার নবজাগরণের প্রধান বা প্রাণপুরুষ রামমোহনই সর্বপ্রথম ভারতীয়, যিনি যুদ্ধ ও রক্তপাতের পথ পরিহার করে বিশ্ব-মৈত্রী বা আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বিশ্ববাসীকে আগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বস্তুত এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন রামমোহনের যথার্থ অনুগামী বা উত্তর-সাধক। তাঁর বালক বয়সের রচনা (১৬ বছর), 'কবিকাহিনী' (ভারতী-১২৮৪) থেকে শুরু করে একেবারে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কবি এই আদর্শের কথা বার বার ঘোষণা করে গেছেন। 'কবিকাহিনী'র শেষ সর্গে কবি গাইলেন ঃ

'কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে—
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানবমনে বিষ মিশাইয়া!

*   *   *   *

কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য,
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময়পদাঘাতে দিতেছে ভাঙিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার!

*   *   *   *

অত্যাচার-গুরুভারে হোয়ে নিপীড়িত
সমস্ত পৃথিবী, দেব, করিছে ক্রন্দন!
সুখ শান্তি সেথা হোতে লয়েছে বিদায়!
কবে, দেব, এ রজনী হবে অবসান?

*   *   *   *   *

'সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার!

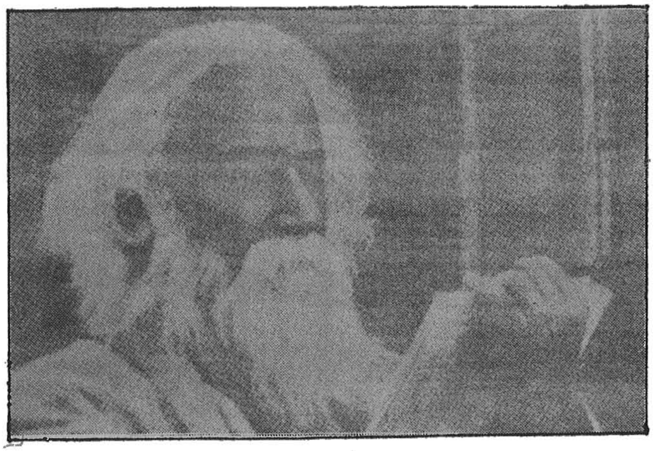
*   *   *   *

'সে দিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়।

পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো,
কিন্তু এক দিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।'

বস্তুত, এই ভূমিকা করেই,—এই আশা এবং দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেই যেন রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্য ও শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর সারা জীবনের শিল্প-সাহিত্য এবং কর্ম-সাধনার যেন ভূমিকা লেখা হয়ে গেছে, তাঁর এই কবিতায়।

উনিশতকের শেষ ভাগে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্য ভয়াবহ যুদ্ধ-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কবি তাঁর তীব্র



মানসিক যন্ত্রনা ক্ষোভ ও ধিক্কার জানিয়ে বললেন, (বঙ্গদর্শন–জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮)

'য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে তাহার পূর্ব সূচনা দেখা যাইতেছে।'

এরই বছরখানেক পর লিখলেন (আষাঢ় ১৩০৯)ঃ

'বাণিজ্য জাহাজে উনপঞ্চাশ পালের হাওয়া লাগিয়াছে, য়ুরোপের প্রান্তরে উন্মত্ত দর্শকবৃন্দের মাঝখানে সারি সারি যুদ্ধঘোড়ার ঘোড়দৌড় চলিতেছে, এখন ক্ষণকালের জন্য থামিবে কে? .....বর্তমানকালে সাম্রাজ্যলোলুপতা সকলকে গ্রাস করিয়াছে এবং জগৎ জুড়িয়া লণ্ডভণ্ড চলিতেছে।'

এর প্রায় ১৪ বছর পর প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে (১লা আগস্ট, ১৯১৪)। কবি শান্তিনিকেতন মন্দিরে এক ভাষণে (মা মা হিংসীঃ) বললেনঃ

'সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। .....এক-এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হবার জন্যে তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে।.....

'আজ অপ্রেমের অন্ধকারের মধ্যে, রক্তস্রোতের মধ্যে এই বাণী সমস্ত মানুষের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছে। এই বাণী হাহাকার করতে করতে আকাশকে বিদীর্ণ করে বয়ে চলেছে। সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। এই বাণী যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে মুখরিত হয়ে আকাশকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।.....'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এবং তার মহাবিধ্বংসী হত্যালীলার সংবাদে কবির হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। ফ্রান্সের পতনের মুখেই কবি লিখলেন (২২শে মে, ১৯৪০)ঃ

'শ্মশান-বিহার বিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা
শত স্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি পান।
এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ যুগের অন্ত হবে
মানব তপস্বী-বেশে
চিতা ভস্ম-শয্যা তলে এসে
নবসৃষ্টির ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।'

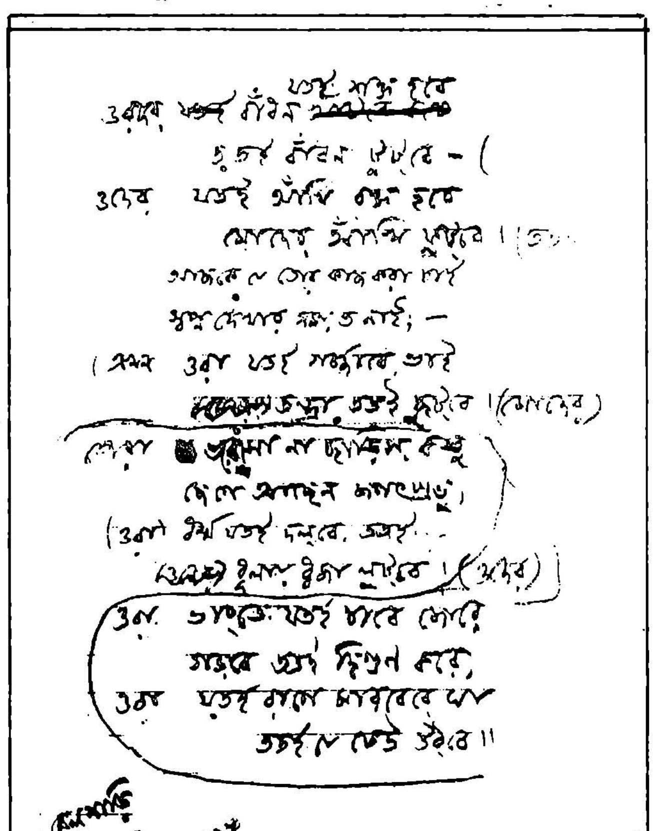
আন্তর্জাতিকতাবাদ ও পরাধীন দেশের মুক্তি-সংগ্রামের সমর্থনে ঃ

রামমোহন বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত ও পরাধীন দেশের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি তাঁর পূর্ণ নৈতিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিলেন। অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীর হাতে নেপলসবাসীদের পরাজয়ের সংবাদে রামমোহনের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যায়। তিনি তাঁর মনোবেদনা ব্যক্ত করে বন্ধু সিল্ক বাকিংহামকে এক পত্রে লিখেছিলেন (১১ই আগস্ট ১৮২১)ঃ '.....I consider the cause of the Neopolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.'

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই আশ্চর্য বোধ ও চেতনাটি সক্রিয় দেখা যায়—তাঁর অল্প বয়সের রচনা 'চীনের মরণের ব্যবসায়' (১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ) হতে শুরু করে, একেবারে তাঁর শেষ রচনা সভ্যতার সংকট পর্যন্ত। একবার জনৈকা ইংরেজ মহিলা কবির ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ- বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে এক—চোখোমীর অনুযোগ করলে, কবি তার জবাবে লেখেন (১১ই এপ্রিল, ১৯২১)ঃ

'.....I deeply feel for all the races who are being insulted and injured by the ruthless exploitation of the powerful nations belonging to the West or the East. I feel as much for the Negroes, brutally lynched in America, often for economic reasons, and for the Koreans, who are the latest victions of Japanese inperialism as for any wrongs done to the helpless multitude of my own country.'

এশিয়ার দেশে দেশে এই স্বাধীনতা ও মুক্তি-চেতনা, এই 'নবজাগরণ'কে প্রত্যক্ষ এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করার জন্য কবি এশিয়ার



দেশে দেশে গিয়েছেন। ১৯৩২ সালে তাঁর সর্বশেষ বিদেশ-ভ্রমণে পারস্যে গিয়ে কবি বললেন ঃ

'আমরা আজ মানুষের ইতিহাসে যুগান্তরের সময়ে জন্মেছি। য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে হয়ত বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পটপরিবর্তন হচ্ছে। এশিয়ার নবজাগরণের লক্ষণ এক দিক হতে আর-এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মানবলোকের উদয়গিরি-শিখরে এই নবপ্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিস্ বটে—এই মুক্তির দৃশ্য। মুক্তি কেবল বাইরের বন্ধন থেকে নয়, সুপ্তির বন্ধন থেকে, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বন্ধন থেকে।

'আমি এই কথা বলি, এসিয়া যদি সম্পূর্ণ না জাগতে পারে তা হলে য়ুরোপের পরিত্রাণ নেই। এসিয়ার দুর্বলতার মধ্যেই য়ুরোপের মৃত্যুবাণ। এই এসিয়ার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে যত তার চোখ রাঙারাঙি, তার মিথ্যা কলঙ্কিত কূটকৌশলের গুপ্তচরবৃত্তি। ক্রমে বেড়ে উঠেছে তার সমরসজ্জার ভার, পণ্যের হাট বহুবিস্তৃত করে অবশেষে আজ অগাধ ধনসমুদ্রের মধ্যে দুঃসহ করে তুলেছে তার দারিদ্র্যতৃষ্ণা।

'নূতন যুগে মানুষের নবজাগ্রত চৈতন্যকে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় একদিন পূর্ব-এসিয়ায় বেরিয়ে পড়েছিলুম।.....দেখলুম জাপান য়ুরোপের অস্ত্র আয়ত্ত করে এক দিকে নিরাপদে হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার রক্তে প্রবেশ করেছে য়ুরোপের মারী, যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্, সে নিজের চার দিকে মথিত করে তুলছে বিদ্বেষ। তার প্রতিবেশীর মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল।.....'

[পারস্যযাত্রী পৃ ১৮-১৯]

স্মরণ রাখা দরকার, এর কয়েক বছর পর—১৯৩৮ সালে জাপানী কবি নোগুচি 'এসিয়া এসিয়াবাসীদের জন্য এই অজুহাত তুলে চীনে জাপ-আগ্রাসনের সমর্থনের চেষ্টা করলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তীব্র পত্র-বিতর্ক হয়।

বিজ্ঞানশিক্ষা ও চেতনা ঃ

রামমোহন-দ্বারকানাথ প্রমুখ বাংলার নবজাগরণের পুরোধারা আধুনিক বিজ্ঞান এবং আধুনিক কৃষি ও যন্ত্রশিল্প ও কারিগরী বিদ্যা আয়ত্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্যোগে বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চা শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ পরম উৎসাহভরে তাকে স্বাগত অভিনন্দন জানান। ডাঃ মহেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত 'সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের' (Indian Association for the Cultivation of Science) সম্পর্কে কবির গভীর আগ্রহ ও আশা ছিল। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা ও চর্চার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি বললেন (১৩০৫)ঃ

'.....বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হইবে'

তিনি বললেন, 'আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলাদেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক, তাহা হইলেই বিজ্ঞানসভা সার্থক হইবে।'

তিনি বললেন, বিজ্ঞান-চেতনার ফলেই মনের যাবতীয় অন্ধকার দূর হয়, সমস্ত অন্ধ কুসংস্কারের হাত থেকে মানুষ মুক্তি পায়। আর এই কারণেই আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা ও চর্চার বেশি প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা-চর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর চরকাতত্ত্ব বা 'হিন্দ্-স্বরাজ'-এর আর্থনীতিক-দর্শনকে একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এবং প্রায় সারা জীবন ধরে গান্ধীজীর আর্থনীতিক-দর্শনের প্রবল বিরোধিতা করে আধুনিক বিজ্ঞান, যন্ত্রশিক্ষা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সপক্ষে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কবি তাঁর বিখ্যাত 'শিক্ষার মিলন' শীর্ষক ভাষণের শুরুতেই বললেন,

'এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি।.....'

'এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোক যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা বিদ্যা যে সত্য.....

'.....বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না। এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাহিরের জগতের সকল সংকট তরে যাচ্ছে।.....'

স্মরণ রাখা দরকার, স্বদেশী আন্দোলনের শেষপর্বে আধুনিক কৃষি ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং গো-পালন বিদ্যা শিখে আসার জন্য পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে কবি আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। দেশে ফেরার পর তাঁদেরকে যন্ত্রচালিত বৈজ্ঞানিক চাষ আবাদ ও গো-পালনকেন্দ্রে স্বয়ং উৎসাহ দিয়ে কাজে লাগিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, দেশে 'কো-অপারেটিভ বা সমবায়-ভিত্তিক যন্ত্রচালিত-কৃষিখামার আন্দোলনের রবীন্দ্রনাথই প্রথম সূচনা করেন। সোভিয়েট দেশের বিজ্ঞান-শিক্ষার এবং সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রথায় আধুনিক যন্ত্রচালিত সমবায় খামারগুলির বিস্ময়কর অগ্রগতির সাফল্য দেখে কবি খুবই বিস্মিত হয়ে বার-বার তার তারিফ করেছেন। রাশিয়ার চিঠি'র এক জায়গায় কবি লিখছেন ঃ

'একটা কথা মনে রেখো—এরা নানা জাতির লোক কল-কারখানার রহস্য আয়ত্ত করবার জন্যে এত অবাধ উৎসাহ এবং সুযোগ পেয়েছে, তার একমাত্র কারণ যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। যত লোকেই শিক্ষা করুক তাতে সকল লোকেরই উপকার, কেবল ধনী লোকের নয়। আমরা আমাদের লোভের জন্যে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাতলামির জন্যে শাস্ত্রিদিই তালগাছকে।

'সেদিন মস্কৌ কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে।.....'

.....'কৃষি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, জার্জিয়া, য়ুক্রেন প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশেও স্থাপিত হয়েছে।'

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে ঃ

সংবাদপত্রের এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবীতে রামমোহন-দ্বারকানাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নরেশ সেনগুপ্ত প্রমুখ বাংলার প্রায় সমগ্র নবজাগরণ পর্যায়ের লেখক-শিল্পীদের এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের। ১৮৯৭ সালে র‍্যান্ড হত্যার পর তিলক ও নাটু-ভাইদের গ্রেপ্তার এবং Sedition Bill ও অন্যান্য ফৌজদারী বিধির প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু হয়, রবীন্দ্রনাথ তার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এই স্বৈরতন্ত্রী দমননীতির প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে যে জনসভা হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐতিহাসিক 'কণ্ঠরোধ' শীর্ষক ভাষণটি পাঠ করেছিলেন। সেদিন কবি ইংরেজ শাসন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন ঃ

'.....যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরো পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন?.....'

'সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে হাতে-হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না। —সেই নির্বাক নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ংকর নহে। সর্পের অতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ, সেইজন্যই কি তাহা নিদারুণ নহে। সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।.....'

এর অনতিকাল পরে 'বঙ্গভঙ্গ' ও স্বদেশী আন্দোলনকালে পুলিশী সন্ত্রাস, প্রথম মহাযুদ্ধকালে 'ভারতরক্ষা আইন' ও ইংরেজ দমননীতির বিভীষিকা, 'রাওলাট বিল' ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, অ্যান্ডারসনী দমননীতির ও হিজলী গুলিচালনার, আন্দামান ও রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলনে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে—এমনি দেশের ঘোর দুর্দিনে যখনই কবির ডাক পড়েছে, তখনই কবি তাতে সাড়া দিয়েছেন;—ময়দানে বিক্ষুব্ধ জনসভায় দাঁড়িয়ে সারা দেশের নির্বাক মনের আপত্তি ও প্রতিবাদকে বাণীদান করেছেন। সারা জীবনই কবি সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন। স্মরণ রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন All India Civil Liberties Union'-এর অনারারী প্রেসিডেন্ট। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ডাঃ নেভিনসনের আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি বিলেতের National Council for Civil Liberties-এর সহ সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন।

নারীমুক্তি ও নারীপ্রগতি সম্পর্কে ঃ

রবীন্দ্রনাথ যৌবনের সূচনাকাল থেকেই এবং প্রায় সারা জীবনই পুরুষশাসিত সমাজে নারীর উপর পীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে পুরুষশাসিত সমাজের পীড়ন অত্যাচারে নারীর ক্রন্দন ও আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে। প্রায় সারা জীবন ধরেই কবি নারী-শিক্ষা, নারী-মুক্তি ও নারী-প্রগতির পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। ভবিষ্যতে কোনো একদিন নারী-মুক্তির পর—নরনারী উভয়ে সচেতন ও যুক্তভাবে এই ধরনীতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে, এই ছিল নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মূলকথা। তিনি বলেন ঃ

'.....the union of man and woman will represent a perfect co-operation in building up a human history on equal terms in every department of life. The future Eve will lure away the future Adam from the wilderness of a masculine dispensation and mingle her talents with that of her partner in a joint creation of a paradise of their own......'

—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য।

শিল্প-সাহিত্য-ললিতকলা প্রসঙ্গে

সকলেই জানেন, রামমোহন ও দ্বারকানাথই আমাদের দেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন এবং সমন্বয়সাধনের প্রথম সূচনা করেন। এই দিক থেকে জোড়াসাঁকো এবং পাথুরেঘাটার—ঠাকুর পরিবারের এই দুই শরিকের বংশধারার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকাছিল। এব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যত সঠিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, এমনটি এদেশে তখন আর কেউ করতে সমর্থ হন নি। আর শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-নাট্য-নৃত্যকলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তিনি নিজে যেসব সৃষ্টি করে গেছেন তার তো তুলনা নেই।

'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠার পর কবি কিভাবে পাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, সে-ইতিহাস আজ অনেকেই জানেন। কিন্তু আমাদের নবজাগরণের শেষার্ধে 'জাতীয় পুনরুজ্জীবনে'র নামে একটা উগ্র-প্রাচ্যামীর রক্ষণশীলতা আমাদের তখন গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। একসময় রবীন্দ্রনাথ কিছুটা তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। কিন্তু 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথকে স্বয়ং এই 'প্রাচ্যামীর ভূত'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন মিশ্রণের উপর গুরুত্ব দিতে হলো।—শুধু শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি সংগীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-ধারার সংগীত নৃত্যের এই মিলন ও সমন্বয় সম্ভব এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা আরও বৈচিত্র্য ও প্রাণশক্তি দান করতেও পারে।

পারস্য-ভ্রমণকালে এমন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হলে কবি স্পষ্ট বললেন ঃ

'...I have always felt sad that European music has not had any direct influence on our own, that great European composers such as Beethoven have, unlike great European poets or philosophers wielded little or no influence on Eastern cultural movements. For European music is unquestionable great and without doubt our own



music will be richer if it can absorb into its living texture creative influences from European music."

[পারস্যযাত্রী পৃ-১৬১]

এই প্রসঙ্গে 'পারস্যযাত্রী'র ডায়েরীতে কবি আরও লিখেছেনঃ

'.....এসিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্য ভাবের মিশ্রণ চলছে। এই মিশ্রণে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। .....আন্তরিক মিলন ক্রমে ঘটে, যদি সে মিলনে প্রাণশক্তি থাকে; কলমের গাছের মতো নূতনে পুরাতনে ভেদ লুপ্ত হয়ে ফলের মধ্যে রসের বিশিষ্টতা জন্মে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এটা ঘটেছে, সংগীতেও কেন ঘটবে না বুঝি নে। যে চিত্তের মধ্যে দিয়ে এই মিলন সম্ভবপর হয় আমরা সেই চিত্তের অপেক্ষা করছি; য়ুরোপীয় সাহিত্যচর্চা প্রাচ্য শিক্ষিত সমাজে যে পরিমাণে অনেক দিন ধরে অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে, য়ুরোপীয় সংগীতচর্চাও যদি তেমনি হত তা হলে নিঃসন্দেহই প্রাচ্য সংগীতে রসপ্রকাশের একটি নূতন শক্তি সঞ্চার হত। য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলায় প্রাচ্য চিত্রকলার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে এ তো দেখা গেছে; এতে তার আত্মত্ব পরাভূত হয়না, বিচিত্রতর প্রবলতর হয়।'

ইউরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় মার্গ সংগীতের বিরাট এবং প্রায় মৌল পার্থক্যের কথা কবি ভালো করেই জানতেন। তা সত্ত্বেও এ মিলন ও সমন্বয় যে সম্ভবপর—একথা কবি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেনঃ

'.....আমাদের রাগরাগিণী স্বরসংগতিকে স্বীকার করেও আত্মরক্ষা করতে একেবারেই পারে না এ কথা জোর করে কে বলতে পারে? সৃষ্টির শক্তি কী লীলা করতে সমর্থ কোনো-একটা বাঁধা নিয়মের দ্বারা আমরা আগে হতে তার সীমা নির্ণয় করতে পারি নে। কিন্তু সৃষ্টিতে নূতন রূপের প্রবর্তন বিশেষ শক্তিমান প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য আনাড়ির বা মাঝারি লোকের কর্ম নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যেমন তেমনি তার সংগীতেরও মস্ত একটা সম্পদ আছে। সে যদি আমরা বুঝতে না পারি তবে সে আমাদের বোধশক্তিরই দৈন্য; যদি তাকে গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব হয় তবে তার দ্বারা আভিজাত্যের প্রমাণ হয় না।'

অতীতের অন্ধ অনুবর্তন করে যে আমরা কিছুতেই অগ্রসর হতে পারব না, একথা কবি শেষজীবনে আমাদের বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া মানুষ কখনোই তার অতীতকে নিয়ে, এমনকি বর্তমানকে নিয়েও সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আরও, আরও বেশি করে পাওয়ার,—আরও বেশি এগিয়ে যাওয়া'র আকাঙ্ক্ষা তাকে নিয়তই সামনের দিকে তাড়না করছে। ১৯৩৪ সালে নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে (২৭শে ডিসেম্বর) কবি বার বার শিল্পীদের একথাটিই স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেনঃ

'.....ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণের যে গতি প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে তার কল্লোল, তার ধ্বনি একটা কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এক সময় মোগলের আমলে রাজৈশ্বর্য যখন উচ্ছ্বসিত সেই সময় তানসেন প্রভৃতি সুধিগণ সংগীতের যে রূপ দিয়েছিলেন তা তৎকালীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে জড়িত। তখনকার কালের শ্রোতাদের কানে যে গান যথার্থ তাঁদের নিজের অন্তরের জিনিস হবে সেই গানই তাঁরা উপহার দিয়েছিলেন। তা তৎকালীন পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর। সেই surroundings যে আজকে নেই একথা নিঃসন্দেহ.....'

তিনি আরও বলেনঃ

'Classical আমাদের কাছে দাবী করে নিখুঁত পুনরাবৃত্তি। তানসেন কি গেয়েছেন জানি না, কিন্তু আজ তাঁর গানে আর কেউ যদি পুলকিত হন, তবে বলব তিনি এখন জন্মেছেন কেন?.....

'আমি স্বীকার করবো, ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের সৌন্দর্যের সীমা নেই, যেমন অজন্তার মত কারুকার্য আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ছোটো ছেলের মত তার উপর দাগ বুলিয়ে পূর্ণ চিত্রিত করা, সেই কি আমাদের ধর্ম, সেই কি আমাদের আদর্শ?.....

কিন্তু এদেশে আধুনিকতার নামে ইউরোপের আধুনিক কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অন্ধ যান্ত্রিক অনুকরণ কবিকে শেষ জীবনে খুবই পীড়িত করেছিল। তিনি বার বার শুধু এই বলেই সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন যে, ইউরোপের আধুনিক শিল্প সাহিত্যকে এমন যান্ত্রিক নকল করলেই তা আধুনিক ভারতীয় আর্ট হবে না, তেমনি 'Oriental Art'-এর নাম করে অজন্তা-ইলোরা-কাংড়ার অনুবৃত্তি করলেও তাকে সজীব ভারতীয় আর্ট বলা যাবে না। এই প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক পত্রে কবি (২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯) লিখছেনঃ

'.....কোনো এক সময়কার যে প্রাচ্য আর্ট সত্য ছিল সজীব ছিল তারি ছাঁচে ঢালা নকল পদার্থকেই আজ ওরিয়েন্টেল বলে। অবনের মধ্যে যদি প্রাচ্যশিল্পের প্রেরণা থাকে সেটা ভিতর থেকেই কাজ করবে, তাঁর চিত্র দেহের বাইরে রূপ যদি কেবলি অজন্তা কাংড়াভ্যালি আর মোগল আর্টেরই দাগা বুলানো হতে থাকে তাহলে ব্যবসায়ী যাচনদারেরা তাকেই ওরিএন্টাল আর্ট বলে খাতির করবে বটে কিন্তু তাঁকে স্বভাবসিদ্ধ আর্ট বলা চলবে না। অবনের আর্টের যদি স্বাভাবিক প্রাণগত অভিব্যক্তি থাকে তবে তাকে একান্ত বিশেষ শ্রেণীগত মার্কার বেষ্টনীভুক্ত করা চলবেই না। তেমনি আমাদের দেশে হাল আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলচি যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি তাহলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে নেব কী করে? যে কবিদের কাব্যরূপ অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়মপথে চলেছে তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হতে পারে, সনাতনীও হতে পারে অথবা উভয়েই হতে পারে, কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়টের বা অডিনের বা এজরা পাউন্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হতেই পারে না। .....যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায় সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম?'

বক্তব্য এতই সুস্পষ্ট যে এর আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয়ের সার্থক সৃষ্টি শক্তিধর শিল্পস্রষ্টাদের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে, এ বিষয়ে কবি সুনিশ্চিত ছিলেন।

উনিশ শতকের বাংলার ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে, আধুনিক শিক্ষা, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে এবং সেই সঙ্গে স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবীতে রামমোহন, দ্বারকানাথ, ডিরোজিও থেকে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র ও আচার্য রায় প্রমুখ বাংলার নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা যে আন্দোলন বা সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন,—তার নানা স্ববিরোধিতা এবং সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও নানা দিক থেকে তা খুবই গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ।

উনিশ শতকের প্রায় সূচনাকাল থেকেই আমাদের জাতীয় জাগরণ ও সংগ্রাম—যা এতকাল ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার এবং শিক্ষাপ্রসার আন্দোলনের আবরণে পরিচালিত হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল হতে তা ক্রমেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও সংঘর্ষে রূপ নিতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর এই সংগ্রাম-সংঘর্ষে উপরোক্ত ধারার অভ্যন্তরেই নানা পরস্পর-বিরোধী এমন কি স্ববিরোধী ধারারও এক বিচিত্র মিলমিশ ঘটেছিল। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের সমাজ-আর্থনীতিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রধানত তা ঘটেছে। এসব সত্ত্বেও একটা জায়গায় এঁদের সকলের রচনা ও শিল্পকর্মে এবং কার্যকলাপে একটা মূল সুর ধ্বনিত হয়েছিল। সেটা হচ্ছে:

এঁদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা, স্বদেশপ্রীতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা যা দেশের তৎকালীন অগ্রগতি এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শক্তিশালী ও প্রেরণাদান করেছিল।

প্রথম পর্ব : (১৯০০—১৯১৮)

এই পর্বে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের সংকটের সূচনা, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, ১৯১৪-১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। একদিকে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত কারণে পৃথিবীর বাজার ও উপনিবেশের জন্য সাম্রাজ্যবাদী

শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ-সংঘর্ষ, অপরদিকে পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির ক্রমবর্ধমান স্বাদেশিকতাবোধ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা ও আন্দোলনের সূচনা। দক্ষিণ আফ্রিকার 'বুয়র-যুদ্ধ' চীনের 'বকষার বিদ্রোহ' ও ভারতবর্ষ ১৯০৫-০৮ সালের প্রত্যক্ষ রাজনীতিক সংগ্রাম-সংঘর্ষের সূচনা। বস্তুত এসবই এশিয়া-আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করে।

এই পর্বে ভারতে বিশেষ করে বাংলায় 'বঙ্গ-ভঙ্গ' আন্দোলন উপলক্ষে প্রবল স্বাদেশিকতাবোধ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল, ডি এল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, মুকুন্দ দাস প্রমুখ কবি সাহিত্যিক ও নাট্যকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথ। এই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে কবি তাঁর সাহিত্যে গানে বক্তৃতায় এবং অন্যান্য সৃষ্টিকর্মে দেশের মধ্যে স্বাদেশিকতাবোধের যে অভূতপূর্ব উন্মাদনা ও প্রাণসঞ্চার করলেন, তার সঠিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার। সংবাদপত্র সাহিত্যে, রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়, 'বঙ্গদর্শন', কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'হিতবাদী', ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' বারীণ ঘোষ ও ভূপেন দত্তের 'যুগান্তর', রামানন্দের 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ', জলধর সেন ও ডি এল রায়ের 'ভারতবর্ষ', সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য', মনোরঞ্জন গুহ, ঠাকুরতার 'নবশক্তি' এবং ইংরেজী দৈনিক সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষের 'অমৃতবাজার' এই আন্দোলনে প্রচন্ড উন্মাদনা ও গতিবেগ সঞ্চারিত করেছিল। এই 'বঙ্গভঙ্গ' ও স্বদেশী আন্দোলনের অভিঘাতে কুমারস্বামী, হ্যাভেল, নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার প্রমুখ শিল্পী ও শিল্পশাস্ত্রীর নেতৃত্বে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে এক নবজাগরণের সূচনা হয়। জাতীয় মুক্তি-চেতনা ও স্বদেশপ্রেমকে সুতীব্র করে তোলার জন্য এঁরা সকলেই তাঁদের কবিতায় গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে ও নাট্যাভিনয়ে, সংগীতে, চিত্রশিল্পে—এককথায় সাহিত্য ও যাবতীয় শিল্পকলার মাধ্যমে দেশকে নেতৃত্বদান করলেন। শুধু সাহিত্য ও শিল্পকলার মাধ্যমেই নয়, বঙ্গভঙ্গ রদ এবং ইংরেজের হিংস্র ও বর্বর দমননীতির বিরুদ্ধে তাঁরা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করলেন—এটাই হলো সবচেয়ে গৌরবময়—সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা।

স্বদেশী আন্দোলনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য :

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপকার্থে (এ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট লিবারেশন মুভমেন্ট) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করলেও তার কতকগুলি মারাত্মক স্ববিরোধী প্রবণতা ও অসঙ্গতিকেও সঙ্গে বহন করে চলেছিল। তার কারণ দেশের তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক বাস্তব অবস্থা, এটাই এই আন্দোলনের এই সব অসঙ্গতিপূর্ণ চরিত্র-বৈশিষ্টটিকে নিয়ন্ত্রিত বা রূপ দান করেছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন এবং ডিরোজিওর 'ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী', বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী চিন্তা-চেতনার এবং সেই সঙ্গে যেসব ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, উনিশ শতকের শেষভাগে তা স্তিমিত হয়ে আসে। এই পর্বে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। চন্দ্রনাথ বসু, শশধর তর্কচূড়ামণি, বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদী রচনা সমূহ,—বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনাবলী, টিলকের 'গীতাভাষ্য' এবং সেইসঙ্গে গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব, 'ভবানী মন্দির' স্থাপন, অরবিন্দ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সরলাদেবীর উদ্যোগে বাংলায় 'ভবানী মন্দির' প্রতিষ্ঠা, 'শিবাজী উৎসব', 'প্রতাপাদিত্য উৎসব', 'বীরাষ্টমী ব্রত' উদ্‌যাপন—এ সবই মিলিত হয়ে উগ্র হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ও উগ্র এবং জঙ্গী হিন্দুজাতীয়তাবাদী (মিলিট্যান্ট হিন্দু ন্যাশনালিজম্) আন্দোলনের সূচনা হয়। জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধকে উজ্জীবিত করার জন্য এই সময়ই অতীত ভারতের সামরিক শৌর্য ও বীরত্বকাহিনীকে অবলম্বন করে উপন্যাস ও নাটক রচনা শুরু হয়। এই সময়ই গিরিশ ঘোষ লিখলেন: 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসেম', 'ছত্রপতি শিবাজী', ক্ষরোদপ্রসাদ লিখলেন: 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'রঘুবীর', 'আলমগীর', 'প্রতাপাদিত্য' 'বাংলার মসনদ', 'নন্দকুমার', 'নূরজাহান', দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেনঃ 'দুর্গাদাস', 'প্রতাপ সিংহ', 'সাজাহান', 'মেবার পতন' ইত্যাদি। আরও অনেক নাটক, উপন্যাস, কবিতা ও যাত্রার পালাগান ইত্যাদি এই সুরেই রচিত হয়েছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথও স্বয়ং এই পর্বে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। এই পর্বে তাঁর কবিতায়-গানে-সাহিত্যকর্মে তার স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। ১৯০৪ সালে সরলাদেবী যখন কলকাতায় 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সেই উপলক্ষে তাঁর বিখ্যাত 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি রচনা করে দেন। অবশ্য টিলক—অরবিন্দ, সরলাদেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী-চিন্তার' (অর্থাৎ মিলিট্যান্ট হিন্দু ন্যাশনালিজম্-র সঙ্গে) মৌলিক পার্থক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর সামরিক শৌর্য ও বীরত্বের মহিমা বা জয়গান করেন নি। কবির হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তাও উপরোক্তদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র ও প্রকৃতির ছিল। প্রাচীন বৈদিক ও 'তপোবন-সভ্যতা' থেকে মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের পর্যন্ত ভারতের ঐক্য ও মিলনমূলক ধর্ম ও আধ্যাত্ম-সাধনার ঐতিহ্য ধারার অন্বেষণ এবং এই পর্বে দেশে তার পুনরুজ্জীবনে তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন। এটা গেল একটা দিক।

কিন্তু এই পর্বে রবীন্দ্রমানসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য যে বৈশিষ্টটি সমুজ্জ্বল হয়ে আছে, তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সংকট ও বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে কবির গভীর উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা। এই পর্বে 'বঙ্গদর্শন'-এ রচিত প্রবন্ধগুলিতে এই সব চিন্তা-ভাবনা আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। বস্তুত, এই পর্বে সমকালীন বাঙালী তথা ভারতীয় মনীষী ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কিন্তু পরদেশ লুণ্ঠন যুদ্ধ আগ্রাসন এককথায় সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতির এই সংকট সম্পর্কে কবির এই গভীর হতাশা ও রাগ শেষ পর্যন্ত তাঁকে কিছুটা প্রতিক্রিয়ামুখী করে তোলে। পাশ্চাত্যের সব কিছু বর্জন করে তিনি অতীতে ভারতের কোলে আশ্রয় ও আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছেন। আর এই কারণেই তিনি ভারতের অধ্যাত্ম সম্পদের পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হয়েছেন—অন্তত এই পর্বে। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই তিনি তার মানস সংকট কাটিয়ে উঠে, ক্রমাগত প্রগতির পক্ষে পর্যায়ক্রমে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। এইখানেই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মহত্ব। এইখানেই সমকালীন ভারতের অন্যান্য মনীষী, নেতা ও শিল্পী—সাহিত্যিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রধান পার্থক্য। এসব কথা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

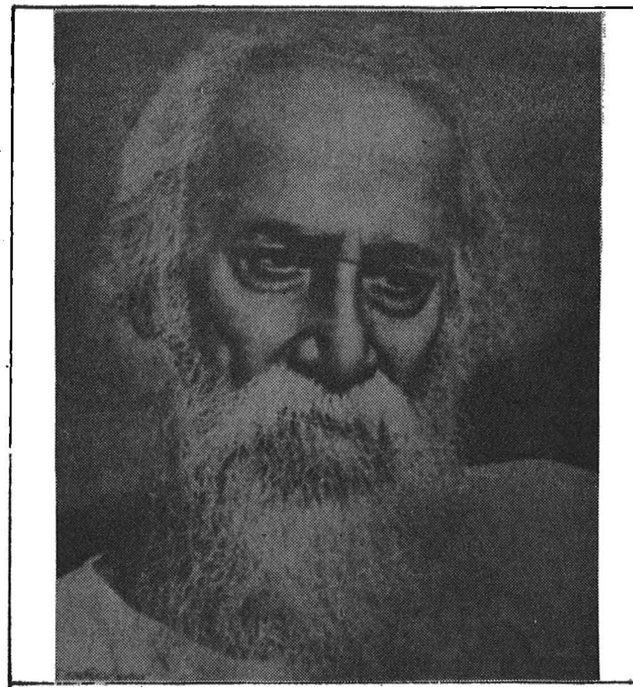
সকলেই জানেন, উনিশ শতকের শেষভাগে কংগ্রেস মঞ্চ হতে জাতীয় আন্দোলনের যে মূল স্রোতোধারাটি (মেন স্ট্রীইম অফ আওয়ার ন্যাশনাল মুভমেন্ট) প্রবাহিত হচ্ছিল, বিশ শতকের প্রথম দশকেই তা দুটি প্রধান ধারায় বইতে থাকে: একটি 'মডারেট' রাজনীতি অপরটা 'একস্ট্রিমিস্ট' রাজনীতি। মডারেটরা 'ব্রিটিশ এম্পায়া'র-এর মঙ্গলকারী ভূমিকা সম্পর্কে আস্থাশীল ছিলেন এবং নিয়মতান্ত্রিক বা কন্‌স্টিটিউশনাল আন্দোলনের মাধ্যমে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-এর মত স্বরাজলাভের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পক্ষান্তরে, একস্ট্রিমিস্টরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পথে বিশ্বাস করতেন। এই একস্ট্রিমিস্টদের মধ্যে নানা-শাখা প্রশাখা ছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সংজ্ঞা ও ধারণা সম্পর্কে ও তাঁদের নানা মতপার্থক্য ছিল। তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও ছিলেন, যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামেই প্রধানত বিশ্বাস করতেন। কিন্তু 'একস্ট্রিমিস্টদের' সকল গোষ্ঠীরই একটি জায়গায় গভীর মিল বা ঐক্য ছিল, সেটা হচ্ছে 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ'। এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীর মধ্যে তিলক, অরবিন্দ, বারীণ ঘোষের নেতৃত্বে হিন্দু-জঙ্গী-জাতীয়তাবাদী চিন্তাই খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল যার ফলে সাম্প্রদায়িক

অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জঙ্গী প্রভাব বেশী কাজ করেছে। সকলেই জানেন ১৮৯০ সালে তিলকের নেতৃত্বে 'গণপতি উৎসব' ও গো-রক্ষা' আন্দোলন উপলক্ষেই ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রথম দাঙ্গা বাধে মহারাষ্ট্রেই। 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের শেষপর্বে (১৯০৮) পূর্ববাংলায় যে হিন্দু মুসলমানের ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত, তার পশ্চাতেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অবদানও খুব কম নয়। ইংরেজদের এবং মুসলিম সম্প্রদায়িকদের তাকে কাজে লাগাতে সাহায্য করেছে। তিলক, থাপর্দে, কেলকার, বিপিন পাল, লাজপৎ রায়, অরবিন্দ ও বাংলার অনুশীলন 'যুগান্তর' প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর জঙ্গী হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিস্তারিত আলোচনার স্থান অন্যত্র। শুধু এখানে এইটুকু বললেই হবে, ধর্ম—বিশেষ করে হিন্দুধর্মের সঙ্গে রাজনীতির ও আধ্যাত্মিকতার ওড়ন-পাড়ন দিয়ে এরা হিন্দু উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে প্ররোচিত ও উজ্জীবিত করেছেন। তারই ফলে 'হিন্দু মহাসভা', 'মুসলিম লীগ'-এর জন্ম হয়।

অবশ্য, এদিক থেকে মডারেটরা রাজনীতিতে কিছুটা সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার ভূমিকা নিয়েছিলেন। কংগ্রেস মডারেট নেতারা প্রথম থেকেই ধর্ম আধ্যাত্মিকতা ও সমাজ-সংস্কার থেকে রাজনীতিকে আলাদা রেখে অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ একটা সুস্থ 'সেক্যুলার পলিটিক্স'-এর মধ্যে ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে রক্ষা এবং তাকে দৃঢ়তা দান করার কাজে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁরা উদাসীন না থাকলেও অন্তত খুব লিবারেল্ ছিলেন। বলা যায়, তাঁরা কিন্তু লিবারেল্স বুর্জোয়াদের ভূমিকা পালন করেছিলেন। অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ 'মডারেট' নেতারা, যাঁরা ব্রাহ্ম আন্দোলনের ধারা থেকে উঠে এসেছিলেন। তাঁরা ধর্ম, সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা প্রসার আন্দোলনের অনেকটা প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তারা মানবিক অধিকারের আন্দোলন করেছিলেন। তেমনি শ্রমজীবীদের নিয়ে মানবিক অধিকার এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজের দ্বারা আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার কথা সকলেই জানেন। চা-বাগানের 'কুলি' ও 'ইনডেঞ্চারড লেবার'দের (Indentured labourer) দাবির বিষয় নিয়েও লিখেছিলেন।

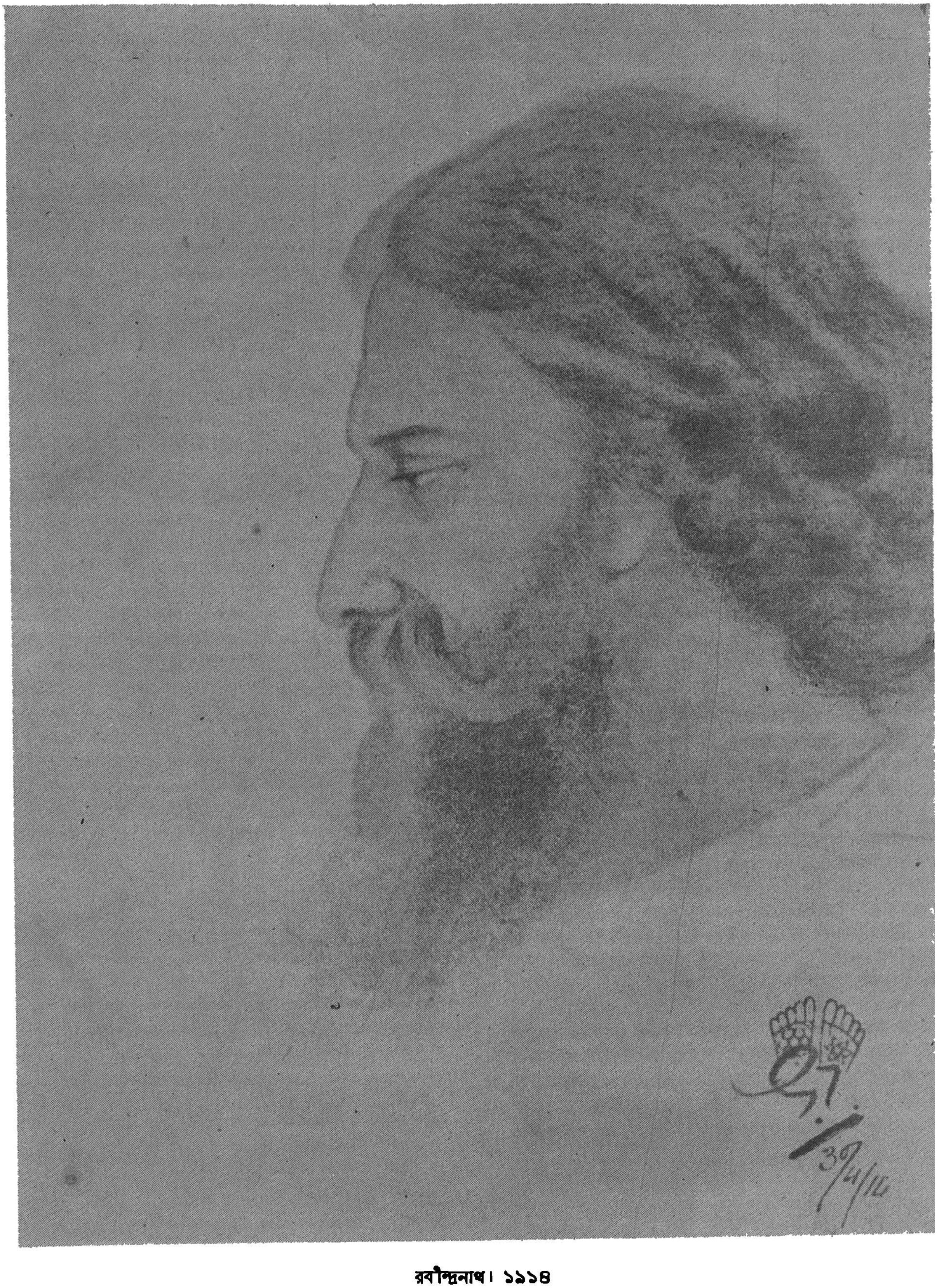
অবশ্য তিলক, নিবেদিতা, অরবিন্দ, সরলাদেবী প্রমুখের জঙ্গী হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখ সাহিত্য-রথীদের 'নব-হিন্দুয়ানী' ও 'আর্যামীর' প্রকৃতিগত অনেক পার্থক্য ছিল। স্মরণ রাখা দরকার, উনিশ শতকের শেষভাগে শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কৃষ্ণ-প্রসন্ন সেন, ('কল্কি' অবতার) প্রমুখের নেতৃত্বে এক প্রবল নব-হিন্দুয়ানী ও আর্যামীর আন্দোলন শুরু হয়। আচারগত হিন্দুধর্ম, বর্ণাশ্রম সমাজ ও হিন্দু সমাজের যাবতীয় কুসংস্কার, এমনকি, হাঁচি টিকটিকি, ও ছোঁয়াছুঁয়ি প্রভৃতি যাবতীয় মেয়েলি কুসংস্কারগত আচারের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কু-যুক্তির অবতারণা বা অনুসন্ধান করতে থাকেন। স্মরণ রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ এরই বিরুদ্ধে কবিতায়-প্রবন্ধে-নিবন্ধে ও ব্যঙ্গ রচনায় বা অবিরত লেখনী-অসিচালনায় বা মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক মাত্রই সেকথা জানেন। এটা শুধু মসীযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রতিপক্ষ গোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে সামাজিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে শশধর তর্কচূড়ামণি, যোগেন্দ্র বসু প্রমুখ নেতারা বিরোধিতা করে আইন-বিরুদ্ধতাজনিত সাজা ও লাঞ্ছনাভোগও করেন। ব্যাপকার্থে, এটাকে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করলে ভুল হবে না। অথচ মজাটা হলো এই যে, এই নব্য-হিন্দুয়ানীর প্রায় সব নেতৃস্থানীয়রাই 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'স্বদেশী আন্দোলনে' সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই যে, এর অল্পকাল পরেই অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই 'গীতাঞ্জলি' এবং 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা' রচনার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে তার পশ্চাৎ বা প্রতিক্রিয়ামুখী সব প্রবণতা হতে যুক্তিবাদী ও

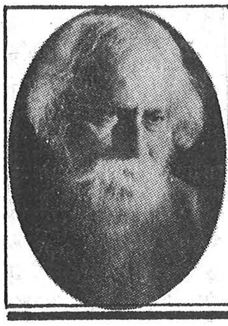


প্রগতিশীল চেতনা এবং বিশ্বমুখী বা বিশ্বমানবতার ভাবাদর্শে অগ্রসর হতে থাকেন। এই পর্বে কবি তাঁর গল্পে-উপন্যাসে-কবিতায় নাটকে এক কথায় তাঁর সাহিত্যকর্মে রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ ও 'নব-হিন্দুয়ানী'র নেতাদের তীব্র আক্রমণ করলেন। এই পর্বে তাঁর অন্যতম দুটি সাহিত্যকীর্তি 'অচলায়তন' নাটক ও 'গোরা' উপন্যাসের উল্লেখ করা যায়। এই পর্বে 'প্রবাসী'তে ও 'সবুজপত্রে' প্রবন্ধগুলিতে এবং 'সবুজের আহ্বান' ও 'বলাকার' অন্যান্য কবিতায় 'নব্য-হিন্দুয়ানা'র 'পরম-প্রবীণ পাকা' নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 'নবীন' ও সবুজ তরুণদের সংগ্রামের আহ্বান জানালেন। রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে কামনা করেছিলেন, বাংলার কংগ্রেস নেতারা জনসাধারণের মধ্যে যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের অভিযানে নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু এদিক হতে শোচনীয়ভাবে কবিকে নিরাশ হতে হয়। বিপিন পাল ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যাঁরা নামকরা ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান হয়েও হিন্দু রক্ষণশীলতাবিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। স্মরণ রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নিবন্ধ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রকাশিত হলে স্বয়ং বিপিনচন্দ্র তার বিরোধিতা করে 'বুদ্ধিমানের কর্ম' নিবন্ধ রচনা করেন।

আগেই বলেছিঃ বিশ্ব ইতিহাসের এই পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাঃ প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ। কিন্তু বিশ্বমহাযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্ররূপ ভারতের কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতাও সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি—একমাত্র কবি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। নেতারা সকলেই, এমন কি, স্বয়ং গান্ধীজী এবং তিলক ও অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ 'চরমপন্থী' নেতারাও যুদ্ধে ইংরেজকে সমর্থন করলেন, এই আশায় যে, যুদ্ধের পর ইংরেজ প্রতিদানে ভারতকে 'স্বরাজ' দেবে। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের শুরুতেই তাঁর বিখ্যাত 'লড়াইয়ের মূল' নিবন্ধে ও 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় এবং এর বছর দুই পরে জাপানে ও আমেরিকায় প্রদত্ত জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম্-বিরোধী বক্তৃতামালায় যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী—চরিত্ররূপ-উদ্ঘাটন করে এই বর্বর ও লুঠেরা সমাজ সভ্যতার ধ্বংস কামনা করলেন। আর সেই সঙ্গে এটাও ঘোষণা করলেনঃ জাতীয়তা ও জাত্যভিমানিতার যুগ শেষ হয়েছে এখন সর্বজাতিক মনুষ্যত্বের যুগের সূচনা হয়েছে। আর শান্তিনিকেতনকে তিনি সর্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার ও মিলনকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করলেন এই আমেরিকায় থাকাকালেই। পরবর্তীকালে এই আন্তর্জাতিকতার আদর্শেই 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই সুপরিচিত।



রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৪
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত



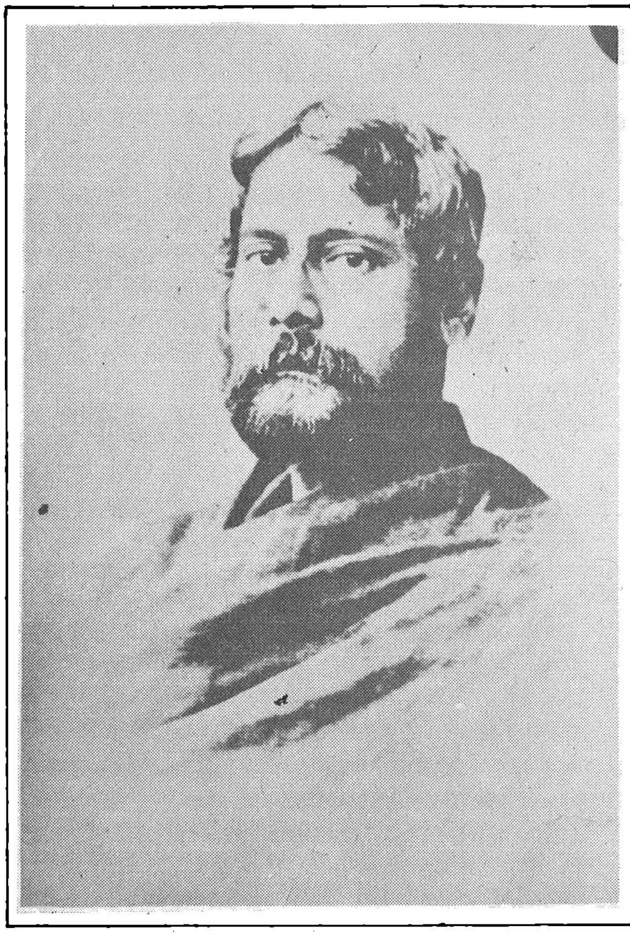
হিন্দুস্হান

ভবতোষ দত্ত

'হিন্দুস্হান' রবীন্দ্রনাথের নবজাতক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত একটি কবিতা। কবিতা লেখার তারিখ ১৯ এপ্রিল ১৯৩৭। লেখা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। নবজাতকের অন্যান্য কবিতা থেকে বিষয়-প্রকৃতিতে এ-কবিতাটি আলাদা। নবজাতকে য়ুরোপ-এশিয়ার নানা যুদ্ধের দারুণ প্রতিক্রিয়ায় লেখা কয়েকটি কবিতা স্হান পেয়েছে 'প্রায়শ্চিত্ত' 'বুদ্ধভক্তি' 'পক্ষীমানব' 'আহ্বান' তাদের অন্যতম। এরকম কবিতা প্রান্তিক কাব্যেও আছে। তবে নবজাতক ও প্রান্তিকের বেশির ভাগ কবিতাই শুদ্ধ কবির নিজস্ব অনুভূতি থেকে রচিত। এদের মধ্যে 'হিন্দুস্হান' কবিতাটি কিছু যেন আকস্মিক। তেমনি আর-একটি কবিতা 'রাজপুতানা'। এ-ও যেন নবজাতক কাব্যে একটু ভিন্ন সুরের।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীতে প্রাসঙ্গিক তথ্য এই যে রবীন্দ্রনাথ আলমোড়া যাত্রার আয়োজন করছিলেন—'এদিকে সংসারের মধ্যে আলমোড়া যাত্রার আয়োজন চলিতেছে, চলার নামেই কবির মন উৎসুক হয়। উত্তর ভারতের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে—হিন্দুস্হান ও ভাগীরথী মনে নানা রূপ ও রসের খোরাক জোগাইতেছে।' হিন্দুস্হান কবিতাটি লেখা হয়েছিল আলমোড়া যাত্রা করার আগেই। উত্তর ভারতের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে কল্পনা করেই যে কবির মনে হিন্দুস্হানের প্রাচীন চিত্রটি ভেসে উঠল, এটা অবশ্য রবীন্দ্রজীবনীকারের ব্যাখ্যা। এ-ব্যাখ্যা সত্য হতে পারে, কিন্তু এই কবিতার পিছনে যে রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের একটা বিরাট পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে, সেটা এই প্রসঙ্গে তাঁর মনে পড়ে নি।

কবি বলেছেন, শিশুকাল থেকেই হিন্দুস্হান তাঁকে আকর্ষণ করেছে। এই হিন্দুস্হানের বিস্তীর্ণ প্রান্তরেই ভারতের ভাগ্যলীলা উত্থানে-পতনে যুগে যুগে আবর্তিত হয়ে এসেছে। সেই সব হারানো রাজাদের কাহিনী দিল্লী আগ্রার প্রাসাদের বিজন-অন্তরালে আজ লুকিয়ে আছে। কতো আক্রমণ প্রতিআক্রমণ! কত নব নব সৈন্যবাহিনী উদ্ধত ধ্বজা নিয়ে ধূলি উড়িয়ে এল, এক রাজবংশের অবসান ঘটিয়ে আর-এক রাজার কাহিনীর সূত্র রচনা করল। তারা এসেছে দস্যুদলের মতো। আসন কাড়াকাড়ি করেছে, ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিয়েছে।



রাত্রিরে ভুলিল তারা ঐশ্বর্যের মশাল-আলোয়-
পীড়িত পীড়নকারী দোঁহে মিলি সাদায় কালোয়

সেখানে রচিয়াছিল দ্যূতখেলাঘর
অবশেষে সেথা আজ একমাত্র বিরাট কবর
প্রান্ত হতে প্রান্তে প্রসারিত;

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় ভারত-ইতিহাসের এক বিষন্ন রূপ এঁকেছেন। সেখানে দেখেছেন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আসন-কাড়াকাড়ি, ঐশ্বর্যের স্পর্ধা এবং নিয়তির হাতে তার লাঞ্ছনা। বিভিন্ন যুগেই বাহির থেকে এসেছে আক্রমণকারীরা; তারা আসে নি প্রেমের বা প্রীতির বাণী নিয়ে, তারা এসেছে হিন্দুস্হানের উর্বর ভূমি থেকে সম্পদ হরণ করতে। কবি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখেন সেখানেও অন্ধকার নিবিড়।

ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়
প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়
বলে যায়—
আরো ছায়া ঘনাইছে অস্তদিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তের।

ভারতবর্ষের অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবির এই নৈরাশ্য আগে দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ বলতেই আমাদের মনে পড়ে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে লেখা তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং কবিতার কথা। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—

'বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য যে শক্তি পাইয়াছে সেই শক্তি চর্চা করিবার অবসর

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও অনার্য বলিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।'

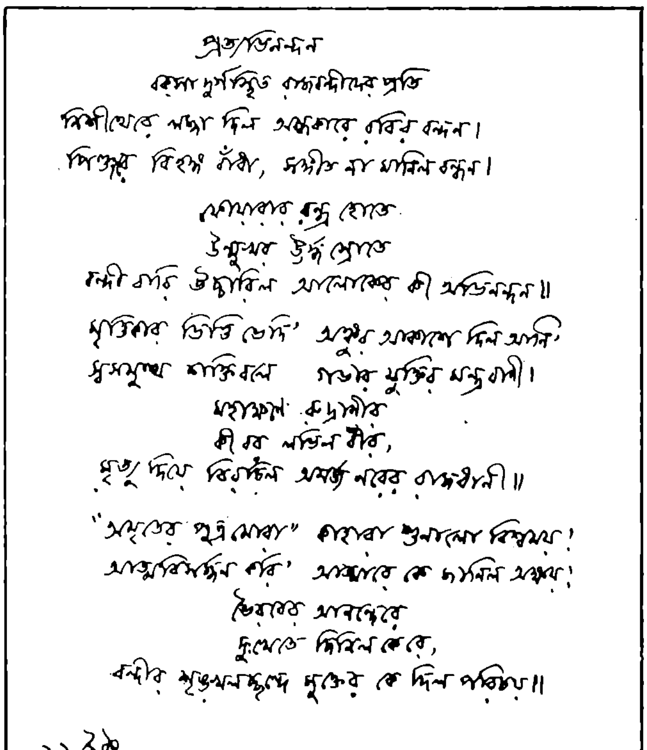
—ভারতবর্ষের ইতিহাস (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩০৯)

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টির কথাই আমরা জানি। 'গোরা' উপন্যাসের উপসংহারে ভারতবর্ষের কল্পনা এই চিন্তারই প্রতিমা। এই ভারতবর্ষ সবাইকে গ্রহণ করে আশ্রয় দেয়, লালন করে। জননী ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এমনই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে তিনি সুবিখ্যাত 'ভারততীর্থ' কবিতাতেও ভারতের এই মূর্তিই দেখেছেন। এই ভারতবর্ষ মহামানবের সাগর। বহু জনতার ধারা এই মানবসাগরে এসে একদেহে লীন হয়ে গেছে। শক, হুন, পাঠান, মোগল সবাই যেমন এখানে এসে মিলে গিয়েছে, তেমনি মিলে যাবে শেষাগত ইংরেজও। পশ্চিমের দ্বার খুলে গেছে, সেখান থেকে উপহার আসছে, বিনিময় হবে মৈত্রীর। ১৯১১-এ লেখা জনগণমন গানটিতেও ঐক্যবিধায়ক ভারত-ভাগ্য-বিধাতারই বন্দনা রচনা করেছেন কবি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্যটি রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব চিন্তা। এই চিন্তা এমনই মৌলিক ছিল যে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন বৃহত্তর পাঠক সমাজের জন্য। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন

'বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা।'

রবীন্দ্রনাথের আগে দু'জন মনীষী ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করেছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র একটি মাত্র প্রবন্ধের মধ্যেই ভারত ইতিহাসের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রবন্ধটির নাম 'ভারতকলঙ্ক'। এটি বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল ১৮৭৩ সালে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের কোনো ভাবমূলক ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল সম্পূর্ণই তথ্যাশ্রিত। তাঁর বক্তব্য এই যে ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে বহুজাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তারা কখনও এক রাষ্ট্রে বন্ধ হয় নি। তাই যখন বিদেশী ভারত আক্রমণ করেছে, বিভিন্ন গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে বিদেশী শত্রুকে বাধা দেয়নি। শক্তির অভাব নয়, একতার অভাবই ভারতের কলঙ্ক। আগে ছিল বৈদিক অথবা সনাতন ধর্ম, তারপর হল বৌদ্ধ ধর্ম, তারপর এল ইসলাম। বহু জাতিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পড়ল। এ দেশে আর জাতি গড়ে উঠবার অবকাশ পেলন না। এগুলি ইতিহাসের সত্য মাত্র। এই তথ্য থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ভারত ইতিহাসের প্রকৃতি ধারণা করে নিয়েছেন। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে বাইরের জাতিরকে প্রবেশ ইতিহাসের সত্য হিসাবে দেখেছেন। তার ফলে সামাজিক পরিবর্তনকেই প্রধান লক্ষ্য করে তুলেছেন। বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষে বিভিন্ন আক্রমণ এবং দেশ ও জাতিগঠনে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিবেকানন্দ সে রকম আলোচনা করেছেন মনে হয় না। বৈদান্তিক দৃষ্টিতেই তিনি unity in Variety র সূত্রটি তাঁর নানা বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করেছেন তাঁর ভারতবর্ষ-সম্পর্কিত চিন্তায়। এই তত্ত্বটিকে তিনি কোন দিনই পরিত্যাগ করেন নি। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি বদল হয়েছে দেখা যায়।


প্রত্যভিনন্দন
বক্সা দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি
নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হোতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দী বারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন॥
মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি' অঙ্কুর আকাশে দিল আনি'
স্বসমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাকাল রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী॥
"অমৃতের পুত্র মোরা" কাহারা শুনালো বিশ্বময়!
আত্মবিসর্জন করি' আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥
১২ জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৮
দার্জিলিং

১৯৩৭-এ লেখা হিন্দুস্থান কবিতাটিতেই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অন্য দৃষ্টিতে দেখছেন। প্রথমত ভারত এই নামটির বদলে তিনি ব্যবহার করছেন 'হিন্দুস্থান'। এই শব্দটির একটি রাজনৈতিক গন্ধ আছে। ভারতবর্ষ বললে শুধু যে প্রাচীন কালবাহিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিসেবিত এবং মুসলমান-অভ্যাগম চিহ্নিত ভূখন্ডকে বোঝায় তা নয়, এর সঙ্গে এর ধ্যান, এর তপস্যা, এর বেদ-পুরাণ-উপনিষদ-সাহিত্য এবং অধ্যাত্মমহিমায় মন্ডিত এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও। কিন্তু হিন্দুস্থান বলতে হিন্দুদের আবাসকেই বোঝায় না, বোঝায় মুসলমানদের ভারতে প্রবেশ কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত জনজীবন অধ্যুষিত ভূখন্ডকে। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে মুসলমানদের আসার পূর্বেকার ভারত সম্পর্কেও এই শব্দটি প্রযোজ্য হবে একটা ভূখন্ডকে নির্দিষ্ট করে বোঝাবার জন্য। বিশেষত 'হিন্দুস্থান' নামটি প্রচলিত হয়েছে মুসলমানদের দ্বারাই। অলবেরুণী তাঁর বইয়ের নাম রেখেছিলেন 'ইন্ডিকা' যা হিন্দুশব্দেরই রূপান্তর। এই হিন্দু শব্দটা ব্রাহ্মন্যধর্ম সম্পর্কে আগে প্রযুক্ত হয় নি। বস্তুত সিন্ধু নাম থেকে হিন্দু এবং তার থেকে হিন্দুস্থান ভারতের বাইরে থেকে আসা প্রাচীন কালের মুলমানদেরই দেওয়া নাম। এই নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নেপথ্য ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ' কবিতায় এঁকেছিলেন ভারতবর্ষের এক ভাবময় ব্যাখ্যা, কিন্তু 'হিন্দুস্থান' কবিতায় বিশেষভাবে দেখিয়েছেন তার রাজনৈতিক চিত্রটি তার বারবার আক্রান্ত হওয়া লুণ্ঠিত হওয়ার বেদনার্ত-ইতিহাস। শুধু তো পাঠান, মোগলরাই বাইরে থেকে এসেছিল তা তো নয়। পূর্বযুগে শক-হুনরাও এসেছিল। তার সমকালীন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু পাঠান-মোগলদের ভারতবর্ষে প্রবেশ এবং জয়ের কাহিনী বর্ণিত আছে মুসলমানদের লেখা ইতিহাস গ্রন্থে এবং নানা আত্মজীবনীতে। তার থেকেই ভারতবর্ষ নিয়ে আসন-কাড়াকাড়ি প্রতাপের দম্ভ, পরাজিতের লাঞ্ছনা, আত্মীয়হনন নানা বিচিত্র ঘটনার সমারোহ। রবীন্দ্রনাথ আবদুল করিম প্রণীত 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' বইটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—

'যাহারা চায় তাহারা যে কেমন করিয়া চায়, এই সমালোচ্য গ্রন্থে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। পৃথিবীর জন্য এমন ভয়ঙ্কর কাড়াকাড়ি রক্তপাত, এত মহাপাতক, একত্র আর কোথাও দেখা যায় না।'

এই ছবির একটি মর্মরূপ রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়েছেন 'হিন্দুস্থান' কবিতায়। এতে ভারতের কোন ভাবরূপ নেই, আছে বিশুদ্ধ ইতিহাসের কথা। রসের

সৃষ্টি হিসাবে 'হিন্দুস্থান' 'ভারততীর্থ' কবিতাটির সঙ্গে তুল্য মর্যাদা পাবে না। তবে হিন্দুস্থানের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে চিত্ররূপ অসাধারণ বিশেষত শেষের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে। বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধটিতে যে বাস্তব ইতিহাসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুস্থান' কবিতাতে সেই বাস্তব ইতিহাসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে পূর্ব-পশ্চিম মিলনের কথা, ভারতের সেই ধ্যানরত ঋষিরূপ, সেই মহামানবের ঐক্যের প্রসঙ্গ কিছুই নেই। 'হিন্দুস্থান' নামটি যেমন বাস্তবগন্ধী, এর ইতিহাসরূপটিও তেমনি প্রখর বাস্তবচেতনাসমৃদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ব্যাখ্যা কী? সেকালের গদ্যপ্রবন্ধগুলিতে কোথাও কী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পরিবর্তিত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়? ১৩৪০-এর শ্রাবণ সংখ্যার পরিচয়পত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি সুপরিচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার নাম 'কালান্তর'। এই প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান রাজত্বকাল থেকে ইংরেজ রাজত্বকালে আমাদের দেশের একটি অর্থপূর্ণ গভীর ভাবাত্মক উত্তরণের বর্ণনা দিয়েছেন প্রধানত সাহিত্য ও সংস্কৃতির সূত্র ধরে। পুরনো যুগ সম্বন্ধে বলেছেন 'অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে। তখনকার দিনে যেমন অত্যাচারের দ্বারা প্রবল ব্যক্তি আপন শাসন পাকা করে তুলত, তেমনি করে অন্যায়ের বিভীষিকায় দেবদেবীর প্রতিপত্তি আমরা কল্পনা করেছি।' কবির এই মন্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে মধ্যযুগের রাজশাসন এবং প্রজাদের অবস্থা। যে অবাধ অত্যাচারের পরিবেশের মধ্যে থেকে দেবচরিত্রের কল্পনা আমাদের সাহিত্য করেছিল, শক্তির সেই দম্ভ ছিল ইতিহাসের রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে। এই পটভূমিকাতেই ইংরেজ এল। যদিও ইংরেজ এসেছিল বণিকের মানদণ্ড নিয়ে যা পরিণত হল রাজদণ্ডে, তথাপি সেই ইংরেজকে সেদিন বাঙালি আর-এক মূর্তিতে কল্পনা করেছিল। ইংরেজ এসেছিল নব্য য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

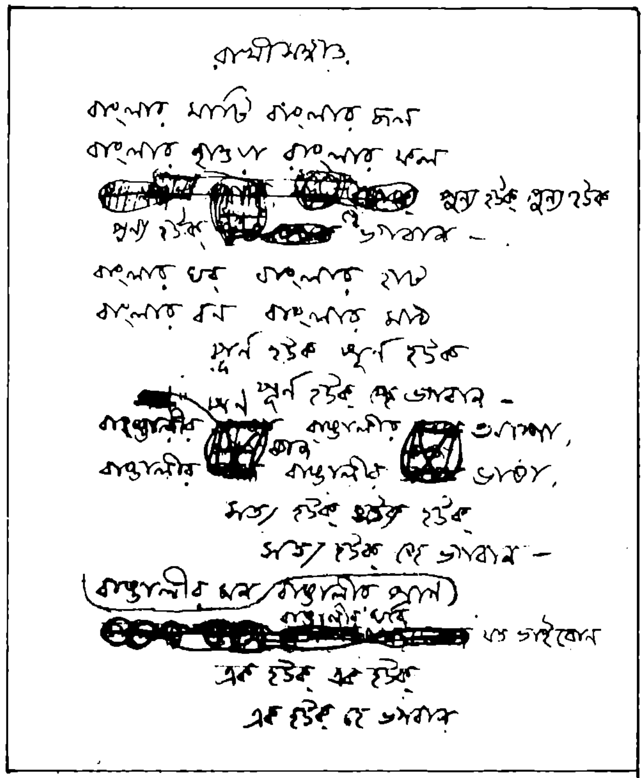
'আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খলমোচনের ঘোষণা, দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন।'

তাছাড়া —'য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর-একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রকাব্যের নির্দেশ, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে মণ্ডিত হতে পারে না।'

'ভারততীর্থ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে পূর্ব-পশ্চিমের দেওয়া-নেওয়ার কথা বলেছেন, সে হচ্ছে এই নূতন মূল্যমান, নূতন মনোভাব। ইংরেজকে আমরা শুধু রাজা বলেই দেখি নি দেখেছি নতুন হিউম্যানিজমের বাণীবাহক-রূপে। এই বানী ও আদর্শকেই তার পীড়নের চেয়ে বড় করে দেখেছিলাম। আর আমরা কি কিছু দিয়েছিলাম? 'দিনে আর নিবে' কথাটির তাৎপর্য কি। অন্তত আমরা ভেবেছিলাম আমরা য়ুরোপ-আমেরিকাকে দিতে পারি আমাদের মানসসম্পদ উপনিষদ-গীতা-রামায়ণ-মহাভারতের তত্ত্ব। তাদের দিতে পারি আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ। বিবেকানন্দ পশ্চিমে গিয়ে নানা বক্তৃতায় ভাষণে এই সম্পদের খবর ওদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তখনও রবীন্দ্রনাথ সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ও দেশে যান নি।

পাশ্চাত্য আমাদের থেকে কিছু নেবে এবং আমরাও ওদের থেকে কিছু নেব—কবির এই বিশ্বাস কয়েক বছরের মধ্যে দাঁড়াবার ভূমি হারাল। ওই কালান্তর প্রবন্ধেই তিনি বললেন—

'ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মহলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর।'

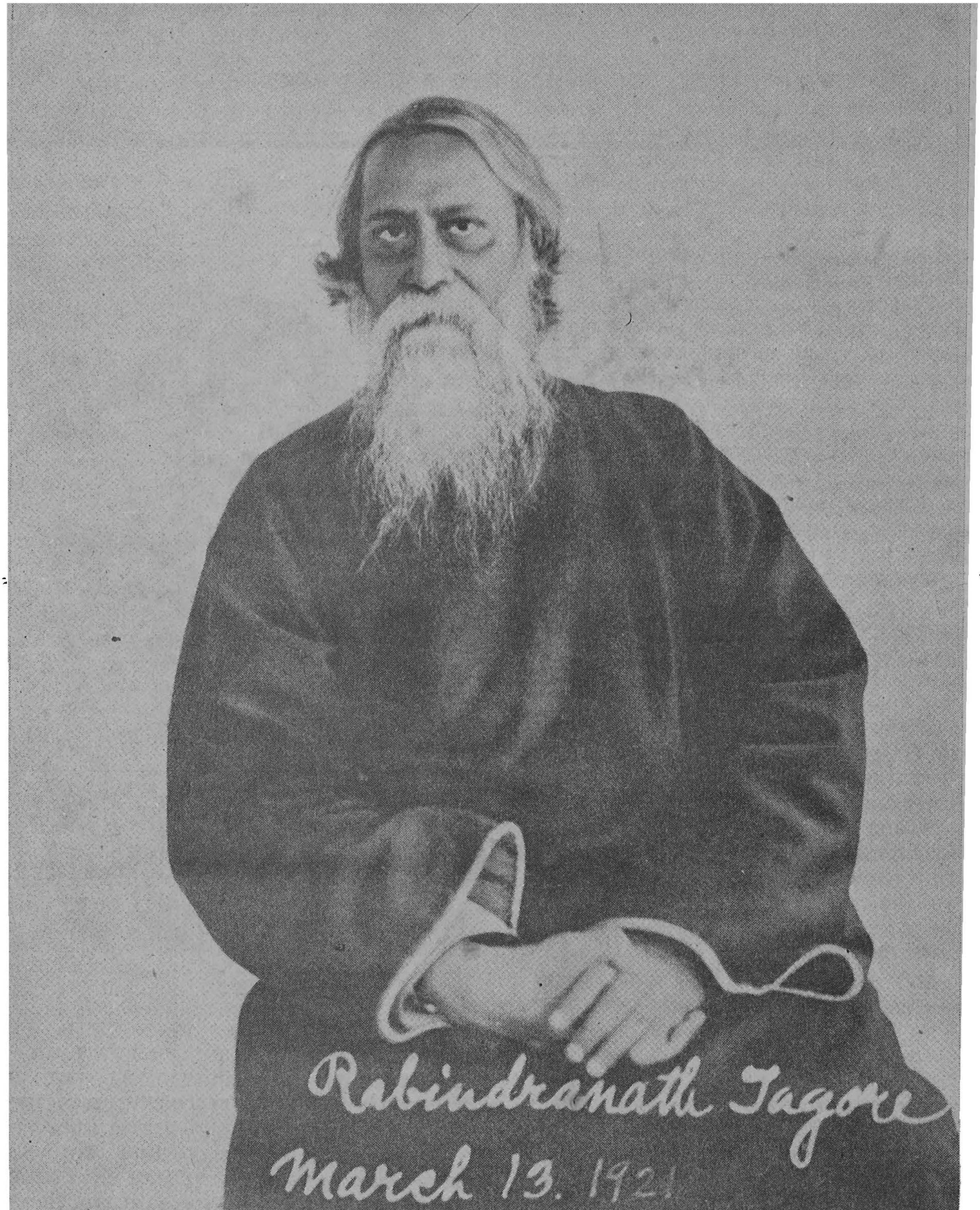


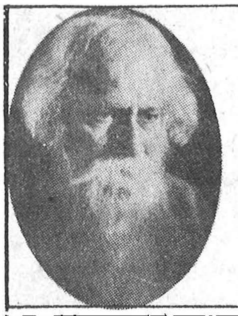
ইংরেজ রাজত্ব ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে আশাভঙ্গ হওয়ার অনেক কারণ ছিল। য়ুরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী প্রসার, প্রথম মহাযুদ্ধের ধনতান্ত্রিক ক্ষুধার জন্য রূপ, আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে জাতীয়তাবোধের বিস্তার—এসব তো ছিলই। চতুর্থ দশকে কবি দেখেছেন চীনের উপর জাপানের আক্রমণ, ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ দশকটিতে পৃথিবীর নানা দেশের রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তে চঞ্চল হয়েছেন। এই সব ঘটনায় কবির মর্মর স্বপ্ন অনেকখানি ভেঙে গেছে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত তথ্য জানবার জন্য নেপাল মজুমদার মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' (১৩৯৪) বইখানা দেখতে বলি। তিনি বলেন 'জার্মানীতে নাৎসীদের বর্বরতা এবং হিটলারের 'ফুয়রর' পদে অধিষ্ঠিত হবার পরবর্তী ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই 'কালান্তর' প্রবন্ধখানি রচিত হয়।'

এসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন বলেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সম্ভব বা প্র্যাকটিক্যাল দৃষ্টিতে দেখেছেন। এখন আর তাঁর মনে হয় না যে ভারতের বাইরে থেকে যারা আসবে তারা আসবে কোনো বাণীদূত হয়ে, কিংবা তারা আসবে ভারতভাগ্যবিধাতার ইচ্ছা পূরণ করতে মহামানবের মহাসাগর রচনা করতে। এখন মনে হয় বিদেশীরা এসেছিল অর্ধরাত্রে মশাল জ্বালিয়ে দস্যুবৃত্তি করতে, আর্তনাদে হাহাকারে ভারতের আকাশ পূর্ণ করতে।

কিন্তু আশ্চর্য এই দেশ ভারতবর্ষ। এত প্রতাপের দম্ভ, শাসকের অত্যাচার, ক্ষমতালোলুপতা-সে-সবই সমাজের উপরের স্তরে। সাধারণ জনজীবন রয়েছে নিস্তরঙ্গ। ওরা নিঃশব্দে কাজ করে যায়, মাঠে মাঠে ধান বোনে, মাঝি দাঁড় টানে, বাউল গান গেয়ে যায়। সেখানে এইসব উত্থানপতনের ঢেউ এসে পৌঁছয় না। সেখানকার জীবন ও মূল্যবোধে কবি এখনও আস্থা রাখেন। শুধু আস্থা রাখেন না, একটা গভীরতর ঐক্যের সন্ধানও যেন পান। 'যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, সেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম নানা জাতি, সেই জন্যেই ভারতের মর্মের বাণী হচ্ছে ঐক্যের বাণী।

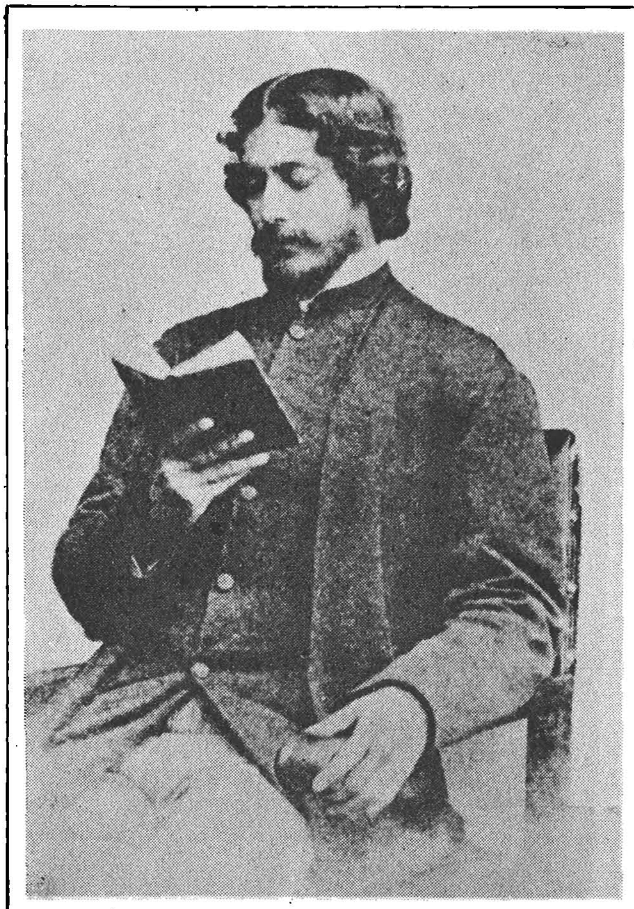
—ক্ষিতিমোহন সেন-রচিত 'দাদু'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ (১৩৩২)


Rabindranath Tagore
March 13. 1921



কবির রচনায় কলকাতার ছবি

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়



মনসামঙ্গলের কাল থেকেই হোক আর জোব চারনকের সময় থেকেই হোক এই কলকাতায় এ যাবত যত মানুষ জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে সেরা মানুষ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলকাতার জন্ম নিয়ে যত তর্ক থাক, এই কলকাতায় জন্মেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে সবসেরা মানুষের নাম নিয়ে তর্ক ওঠার আশঙ্কা বোধ হয় নেই কোনো মহলে। এদেশে আধুনিককালের সূচনা রামমোহন রায়কে কেন্দ্র করে। তিনি জন্মেছিলেন হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে। কলকাতায় বাস শুরু করেছিলেন ১৮১৪ সালে। ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন তখনকার হুগলি জেলার (এখনকার মেদিনীপুর) বীরসিংহ গ্রামে। পিতা ঠাকুরদাসের হাত ধরে লেখাপড়া শিখতে এসেছিলেন কলকাতায় পায়ে হেঁটে, পথে মাইলস্টোন গুণতে গুণতে। পরবর্তীকালে ১৮৭৬ সালে কলকাতার বাদুড়বাগানে বাড়ি করেছিলেন বিদ্যাসাগর। মধুসূদন দত্ত জন্মেছিলেন যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে। কলকাতায় খিদিরপুরে থেকে হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়েছিলেন। গদাধর চট্টোপাধ্যায় জন্মেছিলেন হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে। দাদার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীমন্দিরে পুরোহিতের চাকরির সন্ধানে এসেছিলেন। এখানেই হন রামকৃষ্ণ। ছ্যাকড়া গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় এসেছেন বহুবার—কেশবচন্দ্রের কাছে, গিরিশচন্দ্রের কাছে, দেবেন্দ্রনাথের কাছে, এমন-কি থিয়েটার দেখতেও—কলুটোলায়, বাগবাজারে, জোড়াসাঁকোয়, শ্যামবাজারে। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম চব্বিশ পরগণার কাঁটালপাড়ায়। আইন পড়বার জন্য কলকাতায় আসেন ১৮৫৬ সালে। ১৮৮৭ সালে প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে এক বসতবাটি কেনেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্র এঁরা কেউ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন নি, তবে কলকাতায় বসবাস করেছেন সকলেই। এছাড়া কয়েকজন আছেন যাঁদের পূর্বপুরুষ কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বাস শুরু করেন। যেমন, কেশবচন্দ্র সেনের পরিবার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দর পরিবার। ফলে কেশবচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আর নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় কলকাতা শহরে—কলুটোলা, জোড়াসাঁকো আর শিমুলেপাড়ায়।

কলকাতা যাঁদের জন্মস্থান বা কর্মস্থান তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই কলকাতার খবর পাওয়া যায় সর্বাধিক। জীবনের পঞ্চাশ বছর পার হয়ে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে যখন 'জীবনস্মৃতি' রচনায় হাত দিলেন, তখনকার কলকাতা আর 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত কলকাতার মধ্যে অনেক পার্থক্য ঘটে গেছে। তবে 'জীবনস্মৃতি'তে কলকাতা তেমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি। জোড়াসাঁকোর বাড়িটাই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'র বর্ণনা অনুযায়ী কলকাতা শহরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সপ্রেম সাক্ষাৎ ঘটেছিল সদর স্ট্রীটের দশ নম্বর বাড়ির বারান্দা থেকে। 'জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে' বেড়াতে বেড়াতে 'পাশের বাড়ির দেয়ালগুলি পর্যন্ত' তাঁর কাছে সুন্দর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জোড়াসাঁকোর ছাদের এই নতুন অনুভূতি অর্থাৎ 'জগৎটাকে কেমন করিয়া দেখিলে যে ঠিকমতো দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে নিজের ভার লাঘব হয়' সেদিন সেকথা তিনি কাউকে ঠিকমতো বোঝাতে পারেন নি। 'এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম' যা তিনি পরবর্তী জীবনে বারে বারে স্মরণ করেছেন। এ অভিজ্ঞতা ঘটেছিল সদর স্ট্রীটের বাড়িতে। সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে তখন সেখানে দেখা যেত ফ্রীস্কুলের বাগানের গাছ। 'একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল।' এই বোধ হয় কলকাতা শহরে কবির সঙ্গে প্রকৃতির প্রথম সার্থক যোগ। তাঁর হৃদয়ের সমস্ত বিষাদের আচ্ছাদন ভেদ করে সেদিন 'বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।' সেখানেই শেষ নয়, 'আমি

বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম। রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত।' মানুষের সঙ্গে এই যেন কবির প্রথম যথার্থ যোগ ঘটল কলকাতার পথের দিকে চেয়ে। সেদিন কবির অনুভূতি তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে, 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি/জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'—এ কবিকল্পনার অত্যুক্তি নয়। প্রকৃতির এই উদার ছবি যা সদর স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন এর কিছুদিনের মধ্যে দার্জিলিঙ ভ্রমণকালে শৈলশিখরে তা ধরা পড়ল না। 'সদর স্ট্রীটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপরে চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি আর সেই দৃষ্টি নাই।' ইঁটে গড়া শহর কলকাতাই কবিচিত্তে এক স্থায়ী ছাপ রেখেছিল সেদিন।

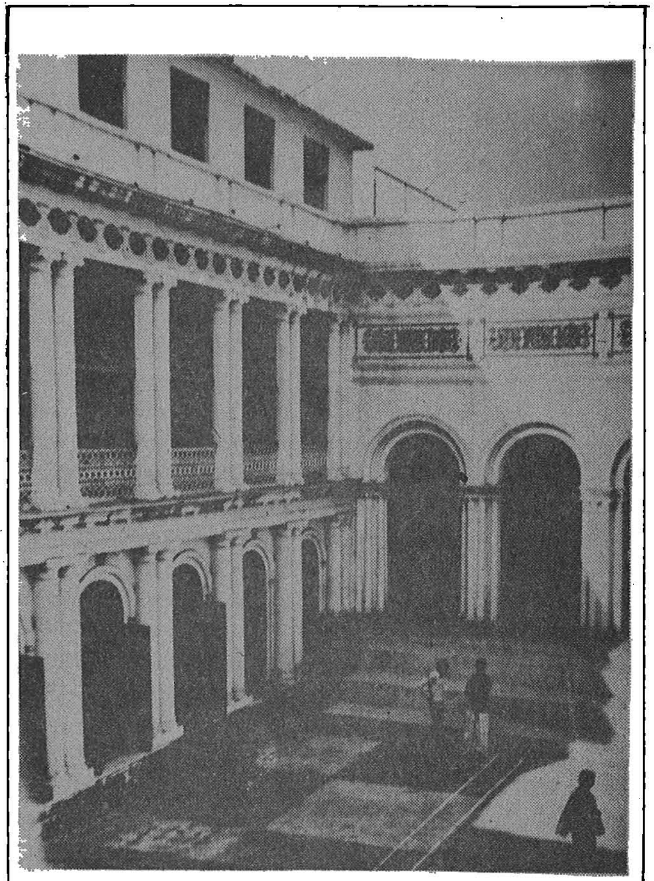
এ গেল কবির চিন্তালোকে এক বিশেষ মুহূর্তে কলিকাতা দর্শন। জীবনের শেষ পর্বে যখন অনুরোধ এসেছিল ছেলেদের জন্যে কিছু লেখার, তখন লিখেছিলেন ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা। এবারে ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের পটভূমিকাস্বরূপ কলকাতা শহরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেই কাঁচা বয়সের কথা লিখতে বসে মনে পড়েছে 'ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে/তপসি মাছের ঝুড়িখানা গামছা দিয়ে ঢেকে।' এ রচনাটি তিনি শুরুই করলেন সেকেলে কলকাতার কথা দিয়ে। 'ছেলেবেলা'য় বর্ণিত সেকেলে কলকাতা এখন আমাদের কাছে ইতিহাসের দলিল হয়ে রয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'তে যেমন তাঁর জীবনের কিছু স্মৃতিকথা, 'ছেলেবেলা'তে সেখানে 'বেলা' অর্থাৎ কালটাই পেয়েছে প্রাধান্য। সেই 'কাল'টাই ধরা পড়েছে এখানে। 'শহরে শ্যাকরা গাড়ি ছুটছে তখন ছড় ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটোর গাড়ি'। বাবুদের আপিসযাত্রার বর্ণনাও বাদ পড়েনি। 'বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে কেউ বা পালকি চড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার আধ ঘোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই-দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর-বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে চলতি মানুষকে'। এমন অনেক ছবি আঁকা আছে পুরোনো কলকাতার। বাবুরা যেমন হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে আপিসে যেতেন, 'মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে।.....বড়োমানুষের ঝি-বউদের পালকির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি'। রাস্তায় যেমন পালকি আর শ্যাকরা গাড়ি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ত না, 'তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি, কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা শেজ।' গ্যাস বা বিজলি বাতির অভাবে 'তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। এখনকার কালো সূর্যের আলোর দিনটা যেমনি ফুরিয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বিজলি আলোর দিন।' তাও তো রবীন্দ্রনাথ ফ্লুরেসেন্ট টিউব বা হ্যালোজেন ল্যাম্পের আলো দেখে যান নি। এতো গেল গাড়ি আর আলোর খবর। 'তখন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁখে করে কলসি ভরে মাঘ-ফাল্গুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল।....তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো জালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই জালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে।' পুরোনো কলকাতার এমন নিপুণ ছবি বাংলা সাহিত্যে আর নেই। দিনের আলো কমে আসার পর সেদিনকার কলকাতা—'তেলকল চলে না, স্টিমারের বাঁশি থেমে থাকে, কারখানা ঘর থেকে মজুরের দল বেরিয়ে গেছে, পাটের গাঁট টানা গাড়ির মোষগুলো গেছে টিনের চালের নীচে শহুরে গোষ্ঠে।...চৈত্র-বৈশাখ মাসে রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত 'বরীফ'। হাঁড়িতে বরফ দেওয়া নোনতা জলে ছোটো ছোটো টিনের চোঙে থাকত যাকে বলা হত কুলফির বরফ, এখন যাকে বলে আইস কিংবা আইসক্রীম।.....আর একটা হাঁক ছিল 'বেলফুল'।'

'জীবনস্মৃতি' বা 'ছেলেবেলা'য় রবীন্দ্রনাথ জীবনকে বা কলকাতাকে দেখছেন স্মৃতির দূরবীন দিয়ে। কালের ব্যবধান থেকে দেখার ফলে ছবিগুলির উপর পড়েছে একটা মমত্বের আর সরল কৌতুকের প্রলেপ। কিন্তু যেখানে কালের ব্যবধানে কলকাতাকে বর্ণনা করেন নি অর্থাৎ যেখানে যে-কালে আছেন সেই কালের কলকাতাকেই বর্ণনা করছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশেই আজকের শহরবাসীদের মতোই প্রতিবাদী বা agitator-এর ভূমিকায় সমাসীন। 'জীবনস্মৃতি' লেখার বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যে সমসাময়িক কলকাতা শহর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর ক্ষুব্ধ মনটি অত্যন্ত স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়। পথিকের জুতাজোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য হইয়া উঠে।.....শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।' এ বর্ণনার সঙ্গে 'জীবনস্মৃতি' বা 'ছেলেবেলা'র ছবি মেলে না নিশ্চয়ই। অথচ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের কাছাকাছি অঞ্চলে বর্ষা নামলে এখনও সেই ছবি যেন শাশ্বত হয়ে ওঠে। আজ থেকে বাহাত্তর বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিছনকার ষাট বছরের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার দুর্গতিকে বিশ্লেষণ করছেন, 'ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইল। তখন বাষ্প ছিল কলীয় যুগের প্রধান বাহন, এখন বিদ্যুৎ তাহাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে শুরু করিয়াছে—ওদিকে মরিবার কালের পিঁপড়ার মতো মানুষ আকাশে পাখা মেলিয়াছে। চীনের মানুষ এক রাত্রে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাফ করিল, এবং জাপান কালসাগরে এমন এক বিপর্যয় লাফ মারিল যে, পঞ্চাশ বছরে পাঁচশো বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জলধারা সম্বন্ধে আমাদের রাস্তার আতিথেয়তা যেমন ছিল তেমনই আছে.....বর্ষাও নামিয়াছে, ট্র্যামলাইনের মেরামতও শুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে, ন্যায়শাস্ত্রে এই কথা বলে। কিন্তু ট্র্যামওয়ালাদের অন্যায়শাস্ত্রে মেরামতের আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাইন কাটার সহযোগে চিৎপুর রোডে জলস্রোতের সঙ্গে জনস্রোতের দ্বন্দ্ব দেখিয়া দেহমন আর্দ্র হইতে লাগিল।' আজকের কলকাতাবাসীও রবীন্দ্রনাথের চোখে চিৎপুর রোডের এই ছবি উপভোগ করবেন, হয়তো বা কিছুটা সান্ত্বনাও পাবেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল কৌতুক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই চিৎপুর রোডের বর্ষাচিত্র আঁকেন নি। প্রশ্ন তুলেছেন, 'সহ্য করি কেন।' চৌরঙ্গি অঞ্চলের সঙ্গে চিৎপুর অঞ্চলের তুলনা করে বলছেন, 'একই শহর, একই ম্যানিসিপালিটি, কেবল তফাতটা এই আমাদের সয়, ওদের সয় না। যদি চৌরঙ্গি রাস্তার পনেরো-আনা হিস্‌সা ট্র্যামেরই থাকিত এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজগমনে চলিত, আজ তবে ট্র্যাম-কোম্পানির দিনে আহার রাত্রে নিদ্রা থাকিত না।' রবীন্দ্রনাথ এমন বিশদভাবে চিৎপুর এবং চৌরঙ্গির তুলনা করছেন ম্যানিসিপালিটির কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য নয়। 'কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার' এই তত্ত্বটিকে বোঝাবার জন্যেই সেদিন রামমোহন লাইব্রেরিতে আর আলফ্রেড থিয়েটারে পাঠ করেছিলেন 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি; স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশও করেছিলেন। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে স্বাধীনতা দূরে থাক্ আত্মকর্তৃত্বের ঘোষণাও তখনও কিঞ্চিৎ দূরে। কেবল হোম রুলের কথাটি তখন আমাদের অভিধানে সবে প্রবেশ করেছে।

কলকাতার অনেক টুকরো টুকরো ছবি রবীন্দ্রনাথের চোখে নিয়তই ধরা পড়েছে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতিতে তিনি যেমন উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, আবার পরস্পরের সামাজিক বিধিনিষেধ নিয়ে বিদ্রূপমিশ্রিত কৌতুকও তিনি করেছেন। এরকম একটি ঘটনা তিনি উল্লেখ করছেন, 'আমি জানি, একদিন একজন রাজা কলিকাতায় আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাঁর তিনি কলেজে-পাসকরা সুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা সারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এমন সময় বাড়ি যাঁর তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন; বলিলেন, 'আপনার

মুখে পান'। গাড়ি যাঁর তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথি মুসলমান।' হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে এ জাতীয় কৌতুকচিত্রই কেবল নয়, ইংরেজ শাসনের কলঙ্ক উল্লেখ করতে গিয়ে 'একেবারে কলিকাতা বড়োবাজারে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানের উপদ্রব প্রচণ্ড' হয়েছিল তার জন্য তিনি শাসকগোষ্ঠিকেই লজ্জিত হতে বলেন, শাসিতদের নয়। 'ইদের দিনে কলকাতায় যেরকম মাথা কাটাকাটি হয়েছে' সেকথাও তাঁর নজরে এড়ায়নি। এবং একথা তিনি উল্লেখ করেছেন অস্পৃশ্যতা-তত্ত্বজনিত অন্ধতার প্রসঙ্গে। কলকাতা শহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গ বারে বারেই তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উৎস যে শহর কলকাতা তাও তিনি অনুভব করেছেন। তিনি শান্তিনিকেতনে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্কের উল্লেখ করে বলেছেন, 'যখন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দূত-সহযোগে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে চলেছে, তখন বোলপুর অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা হয়েছিল।' কলকাতার রাস্তায় 'পুলিস একজন আসামীকে—সে অপরাধ করে থাকতেও পারে, না-ও পারে—কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে সমস্ত রাস্তার জনতার মাঝখান দিয়ে'—এ দৃশ্য মনুষ্যত্বের অবমাননা বলেই মনে হয়েছে তাঁর কাছে। কলকাতা কবিকে খুশি করেছে, ক্ষুব্ধ করেছে, রুষ্ট করেছে। বারে বারেই কলকাতার চিত্র ধরা পড়েছে তাঁর রচনায়। কলকাতা যে ভারতবর্ষ নয় সেকথা তাঁর কাছে না জানা ছিল না। তিনি মেনেছিলেন, 'গঙ্গানদী ভারতের এক বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহু দেশ বহু কাল ও বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয় বাণী আছে।' এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে 'বিদেশী বণিকের হাতে গড়া কলকাতা শহরের মধ্যে ভারতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা সুগভীর ও সুদূরবিস্তৃত।' অথচ এই ছোটো পরিধির মধ্যে শিশুকালে 'অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম বলেই ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।' রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থের ধারণা তাই যেন কলকাতার অসম্পূর্ণতার পটভূমিকাতেই তীব্রভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ' দেখবার প্রয়াস তাঁর সারা জীবনই ছিল। তবে শিলাইদহে গিয়ে বাংলার গ্রামপ্রকৃতির মধ্যে তিনি যে এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন সেকথা স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে স্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'কলকাতার ভিড়ে আমার জীবনটা নিষ্ফল হয়ে থাকে—সেই জন্যে মেজাজ বিগড়ে গিয়ে প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আক্ষেপ করতে থাকি—সকলকে মনের সঙ্গে ক্ষমা করে বিরোধ ত্যাগ করে অন্ত:করণের শান্তি রক্ষা করে চলতে পারি নে।' যদিও এই কলকাতার ভিড়, যতখানি না শহর কলকাতার ভিড় তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁর জোড়াসাঁকোর পারিবারিক পরিবেশ। সেখান থেকে তিনি তাঁর পরিবারকে শিলাইদহে নিয়ে যেতে চান। 'কলকাতার জনতা ছেড়ে হঠাৎ এখানকার মতো শূন্য স্থানের মধ্যে এসে পড়ে প্রথম কিছুদিন নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে না এবং তার পরে সয়ে গেলেও ভিতরে ভিতরে একটা রুদ্ধ অধৈর্য থেকে যাবে। কিন্তু কী করি বলো.....কোনোকালেই আমি কলকাতায় নিজের সমস্ত শক্তিকে গোর দিয়ে থাকতে পারব না।' এবং 'সেইজন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থ দেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি—সেখানে কোনোমতেই লাভক্ষতি আত্মপরকে ভোলবার জো নেই—সেখানে ছোটোখাটো বিষয়ের দ্বারা সর্বদা ক্ষুব্ধ হয়ে শেষকালে জীবনের উদার উদ্দেশ্যকে সহস্র ভাগে খণ্ডীকৃত করতেই হবে। এখানে অল্পকেই যথেষ্ট মনে হয় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয় না।' পারিবারিক পরিবেশের গ্লানি থেকেই যেন ক্রমশ তিনি পল্লীজীবনের সরলতার মধ্যে মুক্তি খুঁজতে চাইছেন। অথচ প্রায় একই সময়ে তাঁর চিঠিতে শহরের অন্য খবরও এসেছে। 'ইলেকট্রিক আলোর তার গগনদের বাড়িতে আসছে, ওদের হয়ে গেলেই অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের শূন্য ঘরেও বিদ্যুতের আলো জ্বলতে শুরু হবে।' ১৯০১ সাল নাগাদ তাঁর বাড়িতে বিদ্যুতের আলো এল। এবং তাতে তিনি খুশিই মনে হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিদ্যুতের আলো সংযোগের খবর যেমন



জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি

পাওয়া যায় স্ত্রীকে লেখা চিঠি থেকে, আবার অন্য ধরনের মজার খবরও পাওয়া যায়, যার সঙ্গে পুরোনো কলকাতার যোগ আছে। কলকাতা-হাওড়ার মধ্যে হুগলি নদীর উপর তখন ছিল ভাসমান সেতু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝে আজকের নতুন সেতু দিয়ে চলাচল শুরু হয়েছে। সেই ভাসমান সেতুর একটি অংশ দিনের কোনো এক সময়ে সরিয়ে নেওয়া হত বড়ো বড়ো স্টিমার নৌকো চলাচলের জন্য। ১৯১৯ সালের ৯ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখছেন, 'এসে শুনি, হাওড়ার ব্রিজ খুলে দিয়েছে। নৌকোয় গঙ্গা পার হতে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলাম। সবে জোয়ার এসেছে—ডিঙি নৌকো ঘাট থেকে একটু তফাতে। একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চলল। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে সুদ্ধ ঝপাস করে জলে পড়ে গেল। আমার সেই ঝোলা-কাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়ে নিশীথ রাত্রে বাড়ি এসে পৌছানো গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছে করে বহুকাল গঙ্গাস্নান করি নি—ভীষ্ম-জননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুললেন।'

চব্বিশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে চিঠিতে কলকাতা নিয়ে কৌতুক করছেন, 'আমাদের প্রবাসের পালা সাঙ্গ করলুম—এখানকার অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি এসব পশ্চাতে রেখে সেই বাঁশতলার গলি, জোড়াসাঁকোর মোড়, সেই ছ্যাকড়া গাড়ির আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড় ঘড়, হুড় মুড়, হৈ হৈ, সেই মাছি-ভনভন ময়রার দোকান, সেই ঘোরতর হিজিবিজি হযবরল-র মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করতে চললুম। সেখানে তিন হাজার গির্জের চুড়ো, কলের চিমনি, জাহাজের মাস্তুল নীল আকাশে যেন গুঁতো মারতে উঠেছে, কলকাতা তার সমস্ত লোষ্ট্রকাষ্ঠ দিয়ে প্রকৃতিকে গঙ্গা পার করেছে—তার উপরে আবার এক পাঁচিল দেওয়া নিমতলার ঘাট। মানুষের মরেও সুখ নেই।.....সেখানে এক প্রকার ইঁটের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করতে

চললুম। সেখানকার সেই লক্ষ লক্ষ কয়েদির সঙ্গে Municipality-র দুর্গের মধ্যে বন্দী হতে চললুম।.....কলকাতার সেই জনতাসমুদ্রের মধ্যে আমার সেই বিরহান্ধকার ঘরটিই কেবল বিজন।' কলকাতার দূষিত পরিবেশের এমন বিশদ বর্ণনা দিয়েও আরেকটি চিঠিতে সেই কলকাতাতেই বন্ধুবরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন,

'রাজছত্র ফেলো শ্যাম,
এসো এই ব্রজধাম,
কলিকাতা যার নাম
কিংবা ক্যালকাটা।
ঘুরেছিলে এইখেনে
কত রোডে কত লেনে,
এইখেনে ফেলো এনে
জুতোসুদ্ধ পা-টা।'

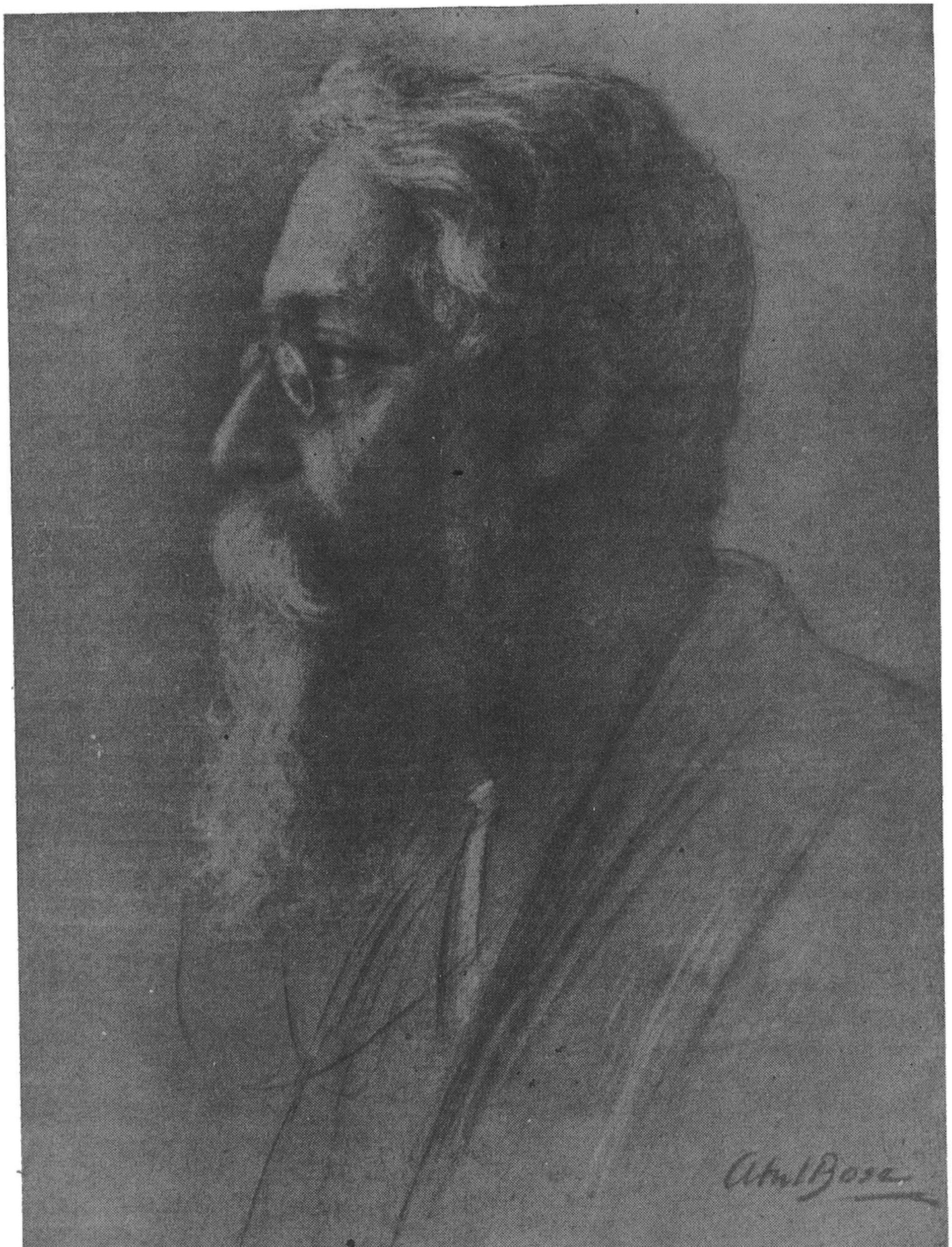
রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি উপন্যাসের ঘটনাস্থল কলকাতা। উপন্যাসে তাঁর চরিত্র এবং ঘটনা কলকাতায় যতখানি ঘুরে বেড়িয়েছে, ছোটোগল্পে ততটা নয়, তবে সবুজপত্র পর্বের গল্পে কলকাতা এসেছে কয়েকবার। 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল বলেছিল, 'আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।' মৃণাল দুর্গম পাড়াগাঁ থেকে কলকাতায় শ্বশুরঘর করতে এসেছিল। সেখান থেকেই সে চলে গেল তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে। সেখান থেকে লিখল, 'তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র।' 'গোরা' উপন্যাস তো শুরুই হয়েছে কলকাতার বর্ণনা দিয়ে। 'শ্রাবণ মাসের সকালবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার বিরাম নেই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কালেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ-তরকারির চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান জ্বালাইবার ধোঁয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তবু এত বড়ো এই-যে কাজের শহর কঠিনহৃদয় কলিকাতা, ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আলোকের ধারা আজ যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।' এই কলকাতায় তিনি সেদিন আলখাল্লা-পরা বাউলের সাক্ষাৎও পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-রচনায় সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির চেয়ে অমর হয়ে আছে কিনু গোয়ালার গলি, যেখানে 'দোতলা বাড়ির/লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর', সেই ঘরে 'আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব/এক ভাড়াতেই/সেটা টিকটিকি।' বর্ষাকালে 'গলিটার কোণে কোণে/জমে ওঠে পচে ওঠে/আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,/মাছের কানকা,/মরা বেড়ালের ছানা,/ছাইপাঁশ আরও কত কী যে' এই 'স্যাঁতসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে/কলে-পড়া জন্তুর মতন/মূর্ছায় অসাড়।/দিনরাত মনে হয়, কোন্ আধমরা/জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।' এ কলকাতাকে চিনতে অসুবিধা হয় না এ প্রজন্মের মানুষেরও। তবে গলির মোড়ের কান্তবাবুর কর্নেটে সিন্ধু বারোয়াঁর তান শুনে 'এ গলিটা ঘোর মিছে' বা 'হঠাৎ খবর পাই মনে/আকবর বাদশার সঙ্গে/হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।' এ অনুভূতির জন্য চাই রবীন্দ্র-মানস, যা এ প্রজন্ম হয়তো বা হারাতে বসেছে।

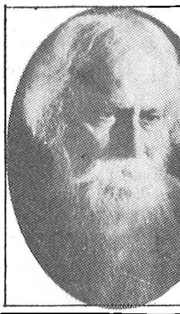
শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবেই লিখেছিলেন 'সহজপাঠ'। তাঁর মনে ছিল গাঁয়ের ছেলেমেয়েরাই এ বই পড়বে অধিক সংখ্যায়। তাই এ বইয়ের বর্ণনায় ঘটনায় শহরকে একটু দূরেই ঠেলে রাখা হয়েছে। পদ্মাপারের বক্সিগঞ্জে হাটের মানুষ চলেছে, ছাদের 'পরে ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয় বেগনি রঙের শাড়ি, পুজোর ছুটিতে স্টিমার ঘাটে লোকজন মেলা এল দূর দেশ হতে—এসব ছবিই বেশি। এরই মাঝে শহরের খবর আসে যখন তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চড়ে শহরে যেতে হয় ইঁটের 'পরে ইঁট সাজিয়ে খেয়ালমতো দেয়াল তুলবার জন্য অথবা কোনো এক বর্ষার দিনে আর্মানি গির্জের কাছে আপিস যাওয়া মুশকিল হবে এই খবর পাওয়া যায়। এই 'সহজপাঠ'-এ হঠাৎ কলকাতা তার সব কিছু নিয়ে হাজির হল একদিন রাতের স্বপ্নে। সেই স্বপ্নে 'কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে', হ্যারিসন রোড, হাওড়ার ব্রিজ, মনুমেন্ট সব যেন সচল হয়ে উঠল সেই স্বপ্নে। এ এক আশ্চর্য কলকাতার স্বপ্নমঙ্গল কবির রচনায়, যা আজকের শিশুকেও খুশি করে তোলে, কলকাতা নিয়ে স্বপ্ন দেখাতে উদ্‌বেজিত করে। তবে নিশ্চিন্ত এই যে সব কিছুর শেষেও 'কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।'



জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ-কক্ষ



রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৯
অতুল বসু-অঙ্কিত



গীতাঞ্জলির হিন্দী অনুবাদ

রামবহাল তেওয়ারী

রবীন্দ্রনাথের মূল বা বাংলা গীতাঞ্জলি (১৯১০) এবং ইংরেজি গীতাঞ্জলি অর্থাৎ Song Offerings (১৯১২) কাব্যদুটি একমনে হলেও আসলে তা নয়। একটির ভাষা বাংলা, স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দোবন্ধ সৃষ্টি এবং সংখ্যার কবিতা ১৫৭। অন্যটির ভাষা ইংরেজি বাংলা থেকে ইংরেজি কাব্যসুলভ গদ্যে অনুবাদ এবং সংখ্যায় কবিতা' ১০৩টি মাত্র। তাছাড়াও অনূদিত কবিতাগুলির মধ্যে গীতাঞ্জলির কবিতা আছে মাত্র ৫৩টি। বাকিগুলির ১৫টি গীতিমাল্য, ১৬টি নৈবেদ্য, ১১টি খেয়া, ৩টি শিশু এবং একটি করে চৈতালি, স্মরণ, কল্পনা, উৎসর্গ ও অচলায়তন থেকে নেওয়া। যেসব কবিতা ও গান আধ্যাত্মিক বিচারে শ্রেষ্ঠ ও সার্থক মনে হয়েছিল— অনুবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ সেইগুলিই বেছে নিয়েছিলেন।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হওয়ামাত্র ইংল্যান্ডেও ইংরেজি ভাষাভাষী দেশের সাহিত্যিক মহলে একটি অভাবনীয় সাড়া পড়ে যায়। বিদেশীভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থ মানুষের চিত্তজগতে এই প্রথম এমন পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে সাহিত্যের ইতিহাসে। একাধারে আধ্যাত্মিক এবং বিশুদ্ধ কাব্যরস স্নিগ্ধ ভারতীয় কবির রচনা পড়ে সে-যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়, বিশেষ করে সাহিত্যিকমন্ডলী অত্যন্ত বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথকে 'নোবেল পুরস্কার' দানের কথা ঘোষিত হয়—বইটি প্রকাশের বৎসরকালের মধ্যেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে সম্মানিত ও স্বীকৃত হলেন। দেশের বৃটিশ শাসক রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে এতদিন নিশ্চুপ ছিল, আর স্বভাষীদের মধ্যেই অনেকে ছিলেন প্রবল রবীন্দ্র-বিরোধী। কিন্তু নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হবার পর তাঁকে সম্বর্ধিত করার জন্য কলকাতা থেকে বিরাট একদল মানুষ বিশেষ ট্রেনে করে বোলপুরে আসে। আশ্রমে সম্বর্ধিত হয়ে কবি বেশ ক্ষুব্ধচিত্তে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বলেন—

> "কবি বিশেষের কাব্যে কেউ বা আনন্দ পান, কেউ বা উদাসীন থাকেন, কারো বা তাতে আঘাত লাগে এবং তাঁরা আঘাত দেন্। আমার কাব্য সম্বন্ধেও এই স্বভাবের নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয়নি, একথা আমার এবং আপনাদের জানা আছে। দেশের লোকের কাছ থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌঁছেছে তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল আমি তা নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময় কি জন্য যে বিদেশ হতে আমি সম্মান লাভ করলুম তা এখন পর্যন্ত নিজেই ভালো করে উপলব্ধি করতে পারিনি।....... আজ য়ুরোপ আমাকে সম্মানের বরমাল্য দান করেছেন। তার যদি কোনো মূল্য থাকে তবে সে কেবল সেখানকার গুণীজনের রসবোধের মধ্যেই আছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তার কোনো আন্তরিক যোগ নেই। নোবেল প্রাইজের দ্বারা কোনো রচনার গুণ বা রসবৃদ্ধি করিতে পারে না। ..... আপনাদের কাছে করযোড়ে জানাচ্ছি—যা সত্য, তা কঠিন হলেও আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু যা সাময়িক উত্তেজনার মায়া, তা আমি স্বীকার করে নিতে অক্ষম।........আমার রচনার জন্য আপনাদের যাঁদের কাছ থেকে আমি প্রীতিলাভ করেছি, তাঁরা



> আমাকে অনেকদিন পূর্বেই দুর্লভ ধনে পুরস্কৃত করেছেন, কিন্তু সাধারণের কাছ থেকে নূতন সম্মানলাভের কোনো যোগ্যতা আমি নূতন রূপে প্রকাশ করেছি একথা বলা অসংগত হবে।"

রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খন্ড (১৯৭৭) পৃঃ—৪৪৮ দেখা যাচ্ছে স্বদেশে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বীকৃতির পথ প্রশস্ত হয়েছে বিদেশে স্বীকৃতি লাভের পর। ভারতের অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের, বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পের স্বীকৃতি ঘটেছিল হিন্দী সাহিত্য

মহলে বহু পূর্বেই। হিন্দীর 'সরস্বতী' পত্রিকায় পৃষ্ঠায় ১৯০১ সাল থেকেই রবীন্দ্র ছোট গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। মুক্তির উপায় (১৯০১), 'দৃষ্টিদান' (১৯০৩), রাজটীকা (১৯০৫), দান-প্রতিদান (১৯০৬) প্রভৃতির অনুবাদের কথা স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়ে মুন্সী প্রেমচাঁদ তা উর্দুতে অনুবাদ করে 'জামানা' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই পাঠ ও অনুবাদ তাঁকে ছোট গল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী- 'জীবনসার'-এ সেকথা তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেছেন। বন্ধুজনকে লেখা পত্রাদিতেও তার উল্লেখ আছে। ১৯১২ সালের মার্চ মাসের সরস্বতীতে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামে বেশ মূল্যবান সম্পাদকীয় লিখে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হয়। ১৯১৬ নভেম্বরে তাঁর 'রামায়ণ' প্রবন্ধটির 'ভাবার্থ' প্রকাশিত হয়। জুন, ১৯১৯ সংখ্যায় মুকুটধর পান্ডের 'গীতাঞ্জলি মেঁ দুঃখ' বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৯২০ সালের জুন সংখ্যায় সরস্বতীতে 'বোলপুরকা শান্তিনিকেতন' (মুকটধর পান্ডেয়) এবং 'ব্রহ্মচর্য-আশ্রম' (মনোহর প্রসাদ মিত্র) নামে দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে এবং হৃদয়বৃত্তির সম্যক পরিচয় তুলে ধরা হয় সশ্রদ্ধচিত্তে। রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী সাহিত্য, বিশেষ করে মধ্যযুগের গল্প সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন ১৯০৮ সালে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন আশ্রমে যোগ দেবার পর। সুতরাং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গীতাঞ্জলির দিকে হিন্দী সাহিত্য মহলের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাবে সেকথা বলাই বাহুল্য। গীতাঞ্জলি হিন্দী কাব্যের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে দেয়। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার রামচন্দ্র শুক্লের মতে—

"রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি নিয়ে যেন একটি কাব্যান্দোলন গড়ে উঠল। আধুনিকতার পক্ষপাতী নূতন কবির দল বাংলার রহস্যাত্মক কবিতার রূপরেখা হিন্দীতে আনতে ব্রতী হলেন, কিছুলোক পাশ্চাত্য কাব্যপ্রথাকে বিশ্বসাহিত্যের লক্ষণ মনে করে তার অনুসরণ শুরু করলেন।"

—হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস (১৯৭৩) পৃ: ৪১১

শুক্লজী অন্যত্র বলেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে হিন্দীতে রহস্যাবিমুখ আধ্যাত্মিকতায় ঋদ্ধ ভাবাত্মক গদ্যের প্রচলন ঘটে।..... তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যটি এই জাতীয় রচনা। হিন্দীতেও এই জাতীয় কাব্য-রচনা শুরু হল। রায় কৃষ্ণদাসের সাধনা, প্রবাল, ও ছায়াপথ, বিয়োগীহরিজীর 'ভাবনা' ও 'অন্তর্নাদ' এ জাতীয় উল্লেখযোগ্য কৃতি। সম্প্রতি ভ্রমরমল সিন্ধী 'বেদনা'-কাব্য লিখেছেন গীতাঞ্জলির অনুসরণে।

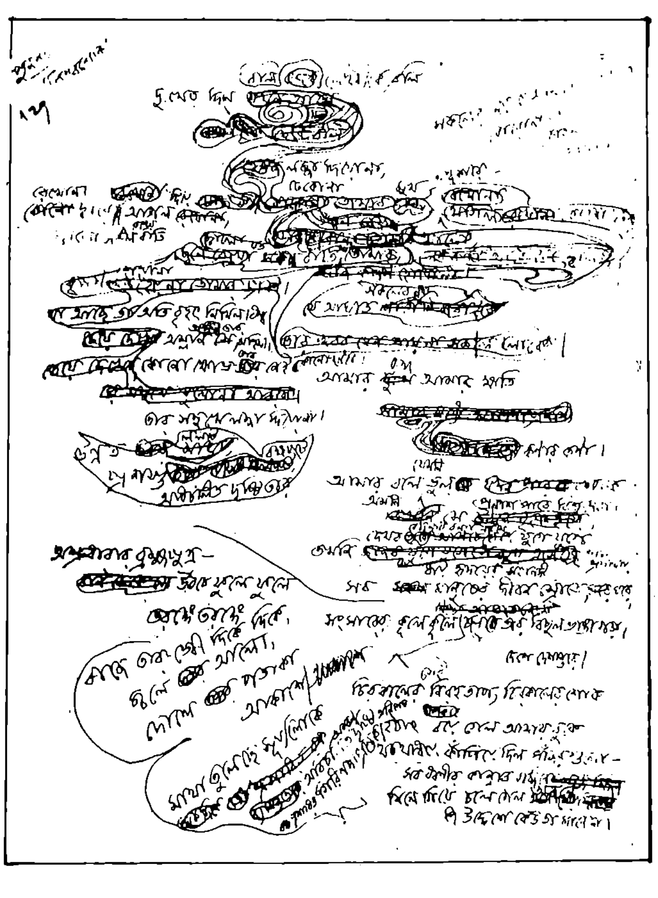
—পূর্ববৎ, পৃঃ-৩৮০

ইংরেজী গীতাঞ্জলির রহস্যাত্মক ভাব ও কাব্যাত্মক গদ্যের প্রয়োগে আকৃষ্ট হয়ে রায়কৃষ্ণ দাস, বিয়োগীহরি এবং ভ্রমর মল সিন্ধী ছাড়াও মাখনলাল চতুর্বেদী, চতুরসেন শাস্ত্রী, প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত এবং রামপ্রসাদ বিদ্যার্থী প্রমুখও গদ্যকাব্য রচনা করেন। নিজের প্রথম গদ্যকাব্য 'সাধনা' (১৯১৯) সম্পর্কে রায়কৃষ্ণদাস বলেছেন—

'সাধনা কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পুষ্ট। তার অভিব্যক্তিতে কোনো নতুনত্ব নেই। তা পুরোপুরিই রবীন্দ্রনাথের।'[১]

হিন্দীতে গীতাঞ্জলির একদিকে যেমন অনুসৃতি ঘটেছে গদ্যকাব্যে, অন্যদিকে তেমনি গদ্যে ও পদ্যে অনুবাদও হয়েছে কাব্যটির। অনুবাদ যেমন ইংরেজি গীতাঞ্জলির হয়েছে, তেমনি হয়েছে বাংলা গীতাঞ্জলিরও। আবার দুই কাব্যের সমস্ত কবিতার অনুবাদও করেছেন কেউ কেউ। অনুবাদ প্রধানত হয়েছে খড়ী হিন্দী বা খড়ী বোলীতে। কিন্তু মৈথিলী ভোজপুরী এবং ব্রজভাষাতেও সহজ-সাবলীল ভঙ্গিতে গীতাঞ্জলি অনূদিত হয়েছে। গীতাঞ্জলির অনুবাদ এখনো হচ্ছে। ভারতীয় সবভাষাতেই গীতাঞ্জলির অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু হিন্দীতেই সম্ভবত হয়েছে সবচেয়ে বেশি।[২] সম্ভবত ২৫ থেকে ৩০ জন এই অনুবাদ করেছেন। কারো কারো অনুবাদের বেশ কয়েকটি সংস্করণও হয়েছে। হিন্দীভাষী কাব্যরসিকদের মহলে রবীন্দ্রনাথের প্রধান-পরিচয় গীতাঞ্জলির কবি রূপে। কবি মৈথিলী শরণ গুপ্ত, জয়শংকর প্রসাদ, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' সুমিত্রানন্দন পন্ড এবং মহাদেবী বর্মা প্রমুখ কবিদের রচনায় রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষ করে গীতাঞ্জলির অনুপ্রেরণা এবং অনুসৃতি সহজেই অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা, ছন্দ এবং কাব্যশৈলী হিন্দী কবিদের রচনায় অভিনবত্ব ও আকর্ষণ এনে দিয়েছে। গীতাঞ্জলির অনুবাদ তাতে পরম সহায়ক হয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। ১৯১৩ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সময়কে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে 'রবীন্দ্রযুগ' বলে কেউ কেউ অভিহিত করেছেন।' এখানে আমরা গীতাঞ্জলির কয়েকটি অনুবাদের বিষয়ে দু'-এক কথা বলে নিতে পারি।

হিন্দীতে গীতাঞ্জলির প্রথম অনুবাদ করেন কবি ও অনুবাদক গিরিধর শর্মা 'নবরত্ন' (১৮৮১-১৯৬১)। তিনি ইংরেজি গীতাঞ্জলির ১০৩টি কবিতা অনুবাদ করেন 'গীতাঞ্জলি' (১৯২৪) নামে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সুনির্বাচিত ১০৩টি কবিতার মাধ্যমে তাঁর আধ্যাত্মিকভাব ও বিশুদ্ধ কাব্যরস পরিবেশিত হল হিন্দী কাব্য রসিক পাঠক সমাজে। কিন্তু তাতে হিন্দী পাঠকের কাছে কবির বক্তব্য পৌঁছুলেও কাব্যরস মাঝপথেই শুকিয়ে যাবার পর সম্ভাবনা। কারণ একে বাংলা ভাষার 'কোমলকান্তকাব্যময়' ভাষা থেকে ইংরেজি গদ্যে রূপান্তর এবং তা থেকে হিন্দীতে অনুবাদ করতে গিয়ে মনের ভাষা ও ছন্দের স্নিগ্ধ উপযোগিতা এবং সাহচর্য থেকে কবিতা বঞ্চিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও গিরিধর শর্মা নবরত্নে'র এই সংশুদ্ধ অনুবাদ সাদরে গৃহীত ও প্রশংসিত হয়। তার পর অরও কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৪৫ সালে ১০১টি কবিতার গদ্যানুবাদ মুদ্রিত হয় প্রতিষ্ঠিত প্রকাশন থেকে, কিন্তু অনুবাদকের নামোল্লেখ নেই। ১৯৪৬ সালে বারাণসীর লালধর ত্রিপাঠী 'প্রবাসী' গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাতে ২১০টি কবিতার পদ্যানুবাদ সন্নিবিষ্ট। এই অনুবাদটির কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। বাংলা গীতাঞ্জলি ও ইংরেজি গীতাঞ্জলি মিলিয়ে ২০৯টি এবং জীবনের শেষ কবিতা নিয়ে ২১০টি। ১৯৩৯ সালের ৫ ডিসেম্বরে লেখা 'সম্মুখে শান্তি পারাবার' ইত্যাদি গানটিও গৃহিত। অনুবাদকের মতে এই গানটি রচনা করে কবি এই বলে রেখে দিয়েছিলেন যে, "এটি আমার মৃত্যুর পর গাওয়া



হবে।" তাই গানগুলির শেষে সংক্ষেপে রবীন্দ্রজীবনী দিয়ে শেষে এই গানটির অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। ইংরেজি গীতাঞ্জলির সঙ্গে W.B. Yeats এর যে সুন্দর ভূমিকাটি আছে, তারও অনুবাদ দিয়েছেন অনুবাদক। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য হল— 'রবীন্দ্রানুসারী' হিন্দী কবি 'সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী' 'নিরালা'র অতি সংক্ষিপ্ত 'দোশব্দ' নামের ভূমিকা। তাতে তিনি লিখেছেন—"মৈনেঁ পন্ডিত লালধর ত্রিপাঠী 'প্রবাসী'জীকা কিয়া হুআ গীতাঞ্জলিকা অনুবাদ দেখা। মুঝকো অনুবাদ সরস ঔর প্রাঞ্জল লগা। সুন্দরে নির্বাহ কিয়া গয়া হৈ। বিশ্বাস হৈ কবিকা আদর হোগা, লোগোঁ কো রচনায়েঁ রুচিকর লাগেগীঁ।"

এইভাবে হিন্দী কবিরা গীতাঞ্জলি অনুবাদে প্রাৎসাহিত হয়েছেন রবীন্দ্রানুরাগী কবিদের সস্নেহ আশীর্বাদে। অনুবাদকে প্রণতি জানিয়ে যা লিখেছেন—তার বঙ্গানুবাদ—

> "তোমার সামনে আমার কবির টিকবে না ফাঁকা অহং ঘোর
> ওগো মহা কবি তোমার চরণে অর্পিতে চাই জীবন মোর।"

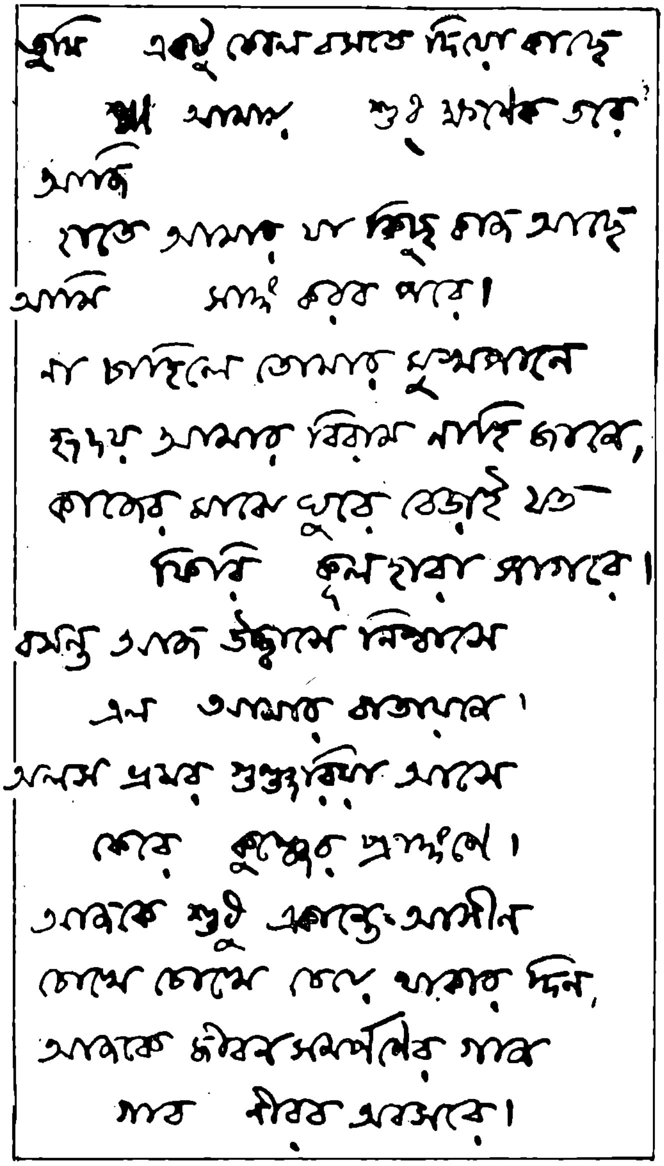
ভবানীপ্রসাদ তিওয়ারী 'রবীন্দ্রনাথ কী অমরকৃতি গীতঞ্জলি'র হিন্দী পদ্যে অনুবাদ করেন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। এটি ইংরেজি গীতাঞ্জলির অনুবাদ। বইটির 'প্রাক্‌কথা' থেকে জানা যায়—শ্রীহরি বিষ্ণু কামাথের অনুপ্রেরণায় তিওয়ারীজী অনুবাদ শুরু করেন। জেলের মধ্যে কামাথ ইংরেজি গীতাঞ্জলি পড়ে শোনাতেন অপরাপর রাজবন্দীদের। তখন ১৯৪২ সাল। কারান্তরালে শ্রীকামাথের কন্ঠে রবীন্দ্রকাব্যানন্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রসের বর্ষা শুরু হল।অনুবাদকের জবানীতে জানা যায়—

> "আমার নিজের জীবন থেকে যদি সেইসব সুন্দর দিনগুলি বাদ পড়ে যায় তো জীবনটা নেহাতই মরুভূমি মনে হবে। সেই সব বাণীর গুঞ্জন এমনই যে তা অন্তরে প্রবেশ করে থেকে গেল। আমার মনে হল—যেন মহাকবি নিজেই সব বলে যাচ্ছেন আর রহস্যভেদ করে চলেছেন।" (প্রাক্‌কথন—পৃঃ-তিন) গীতাঞ্জলির এই অনুগায়ন শ্রীকামাথের আদেশপালন। গান যখন যেমন হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, তেমনিই লেখা হয়েছে। তাই অনুবাদে 'অ-ক্রম ও স্বাচ্ছন্দ্যও আছে।' " (পূর্ববৎ—পৃঃ-'ছ')

অনুবাদটি সুন্দর সুললিত ও স্বচ্ছন্দ। ক্রমে ক্রমে গীতাঞ্জলির হিন্দী অনুবাদে উৎকর্ষ ঘটছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হিন্দী জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সত্যকাম বিদ্যালংকার গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেন ১৯৫১ সালে। গানের সংখ্যা ২০৩। মূল গীতাঞ্জলির ১৫৭টির সঙ্গে খেয়া-নৈবেদ্য প্রভৃতি কাব্যের ৪৬টি কবিতা বেছে নেওয়া হয়েছে, যেগুলি ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে গৃহীত হয়েছিল। এ অনুবাদ গদ্যে। অনুবাদ সম্পর্কে বিদ্যালংকারের বক্তব্য হল—

> "বিশ্বকবির রচনার অনুবাদ বিশ্বের প্রায় সব ভাষাতেই হয়ে গেছে। তার প্রচার-প্রসারও অকল্পনীয়ভাবে বেড়ে চলেছে। জার্মানীতে একজন প্রকাশক জার্মানী ভাষায় অনূদিত গীতাঞ্জলির ৫০ লাখের অধিক কপি বিক্রী করেছেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলির এক ডজনের বেশি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[৩] প্রকাশকদের এক বছরেই নয় একমাসেও তিন-তিনটি বা চার-চারটি মুদ্রণ করতে হয়েছে। সুতরাং গীতাঞ্জলির জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। .....যতদূর জানি রবীন্দ্রনাথের মূল গীতাঞ্জলির হিন্দী রূপান্তর এখনো হয়নি। সুতরাং সে দৃষ্টিতে এটিই প্রথম প্রয়াস বলা চলে।"
>
> "অনুবাদে সেই প্রবাহ, মাধুর্য ও সরসতা কখনোই আসতে পারে না, যা মৌলিক রচনায় থাকে। আর গানের রূপান্তর তো মূলের মতো সরস হতেই পারে না। মূল রচনা ছন্দোবদ্ধ, তাতে সঙ্গীত আছে, সুরের প্রবাহ আছে আর আছে শব্দের মধুর বিন্যাস। অনুবাদে ছন্দ, সঙ্গীত, খবর, প্রবাহ এবং শব্দের তেমন বিন্যাস কিছুই সম্ভব নয়। সুতরাং রবীন্দ্রকাব্যের আনন্দ পেতে গেলে বাংলাভাষা শেখা অবশ্যকর্তব্য। গোপালকৃষ্ণ গোখলে রবীন্দ্র-কবিতার রস-আস্বাদনের জন্য বাংলা শিখে নিয়েছিলেন।"


তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
আজি
হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে।
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে।
বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবনসমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে।

> "একথা সত্য যে রবীন্দ্র-রচনার প্রথম স্পর্শেই অতি সাধারণ অতিশুষ্ক মনের মানুষের চিত্তও আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে। এই গানগুলি অজস্র হৃদয়ে নবজীবন সঞ্চার করেছে, নতুন আলো দিয়েছে, আশা দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গানগুলির ঔজ্জ্বল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ মূল গায়কের বীণা মৌন, তারে আর কম্পন লাগে না, কিন্তু তার ধ্বনি সূর্য-চন্দ্রের কিরণের সঙ্গে আলো হয়ে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছে।"
>
> বক্তব্য; গীতাঞ্জলি (হিন্দী)।

গীতাঞ্জলির গানগুলির আকর্ষণ এবং বিশ্বময় তার খ্যাতি ও স্বীকৃতিই সত্যকাম বিদ্যালংকারকে তার অনুবাদে ব্রতী করেছে। তবে রবীন্দ্র-কাব্যরস পিপাসু পাঠককে তিনি সরাসরি বাংলা গীতাঞ্জলি পাঠের আবেদন জানিয়েছেন।[৪] অনুরোধ করেছেন বাংলা শিখতে। সুতরাং তাঁর রবীন্দ্র-চর্চা আন্তরিক এবং অনুবাদ যে শ্রদ্ধার্ঘ্য সে-কথা বলাই বাহুল্য। তবে মূল গীতাঞ্জলির হিন্দী রূপান্তর আগেও হয়েছে—সেটি তাঁর জানা ছিল না। তা না হলে মূল গীতাঞ্জলির প্রথম হিন্দী অনুবাদের প্রসঙ্গ উঠত না।

১৯৬১ সাল এসে উপস্থিত হলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পঠন-পাঠন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ হিন্দী সাহিত্যেও ঢেউ

তোলে। এলাহাবাদের কৈলাশ 'কল্পিত' গীতাঞ্জলির ১০১টি নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ করলেন পদ্যে 'গীতাঞ্জলি' নামে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের নভেম্বরেই। ভাষাতত্ত্ববিদ্ উদয়নারায়ণ তিওয়ারী এবং সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' বইটির প্রশংসা করেন। নিরালা ইংরেজিতে লেখেনঃ—

"Though mere circumlocution the poetical translation in HINDI, from the most famous bard of Calcutta, of renowned Dr. Rabindra Nath Tagore, unparallel yet in voluminous contribution, in prose and poetry equally, and dauntless pioneer among Nobel Prize holders, because of his gallantry in selection of GEETANJALI, I congratulate the poet KAILASH KALPIT for his enterprise to translate the songs and prove SUCCESS."

উদয়নারায়ণ তিওয়ারীর অভিমত হল—

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি বিশ্বসাহিত্যে এক অনুপম কৃতি। বিশ্বের প্রায় সবভাষাতেই তার অনুবাদ হয়েছে। হিন্দীতেও তার বেশ কয়েকটি অনুবাদ পাওয়া যায়। মহাপ্রাণ নিরালার প্রেরণা ও প্রোৎসাহনে তার আরও একটি অনুবাদ হিন্দীর তরুণ কবি, আমার মিত্র শ্রীকৈলাশ 'কল্পিত' রবীন্দ্রজয়ন্তীর উপলক্ষ্যে প্রকাশ করছেন। বাংলাভাষার গঠন হিন্দী থেকে ভিন্ন আর কবীন্দ্রের ভাব-প্রবণ রসসিক্ত বাণীকে হিন্দীতে রূপান্তরিত করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু শ্রী'কল্পিত'জী এই গুরুতর কাজে পুরোপুরি সফল হয়েছেন। আমি যতদূর দেখেছি এই অনুবাদটি অন্যদের অনুবাদের তুলনায় বেশি সরস বোধগম্য এবং প্রাঞ্জল।"

প্রকাশনকীয় বক্তব্যে বলা হয়েছে 'ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দের সুষ্ঠু ব্যঞ্জনা এবং ছন্দের বৈচিত্র্য অনুবাদটিকে অভিনব করে তুলেছে।' 'ভূমিকা' থেকে জানা যায়—নিরালার কাছে গীতাঞ্জলির বাংলা কবিতা শুনে শুনে অনুবাদকের মনে অনুবাদের অভিলাষ জাগে। ১৯৫৩ সালে কলকাতায় 'নিরালা-অভিনন্দন সমারোহে' নিউ এম্পায়ার থিয়েটার হলে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেছিলেন—

"বঙ্গাল আজ হিন্দীকে মহান কবি 'নিরালা কা অভিনন্দন করতে হুয়ে রবিঠাকুর কো য়াদ কর রহা হৈ, ক্যোঁকি, জিস ভব্য রূপ সে হম আজ নিরালাজীকা স্বাগত কর রহে হৈঁ ওয়ৈসা কেবল গুরুদেব কে নোবুল পুরস্কার জীত কর আনে পরহী কর পায়ে থে।"

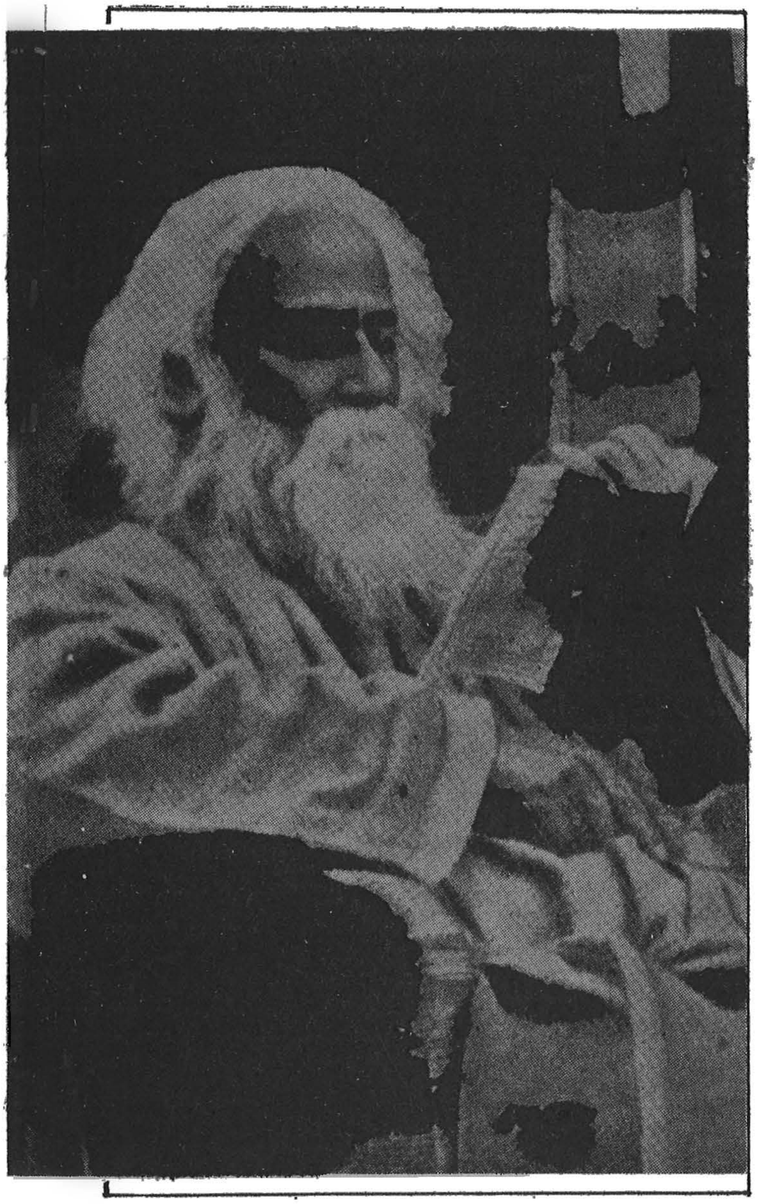
তাঁর এই কথায় অনুবাদক বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হন। বাংলা শেখেন। তারপর নিরালার উৎসাহে অনুবাদ করেন গীতাঞ্জলি। প্রতিটি গানের 'শীর্ষক' দিয়েছেন। যা সর্বৈব অভিনব। বইয়ের পরিশিষ্টে নাগরীলিপিতে কয়েকটি মূল রবীন্দ্রসংগীত, অন্যদের অনূদিত কয়েকটি গান, কঠিন শব্দের অর্থ, সংক্ষিপ্ত রবীন্দ্র-জীবনী এবং রবীন্দ্র-কাব্য সাহিত্যের একটি সম্পূর্ণ তালিকাও সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে বইটির গুরুত্ব ও উপযোগিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুবাদ যে সহজাত বহুলাংশে সাবলীল হয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হংসকুমার তিওয়ারীর অনুবাদ নানা কারণেই উল্লেখের দাবি রাখে। বইটির উৎসর্গপত্রে 'জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মহাকবির পুণ্যস্মৃতিতে তাঁর কৃতি তাঁকেই' বলে, নীচে উদ্ধৃত হয়েছে।

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায়
কীর্তিরে তোমার
বারংবার।।"

'উৎসর্গ' পত্রই অনুবাদকের বাংলা জ্ঞান, রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সাহিত্যিক অভিরুচির পরিচায়ক। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন ইন্দ্র দুগার। তিওয়ারিজী 'বাংলা গীতাঞ্জলিরই' পুরোপুরি অনুবাদ করেছেন অর্থাৎ অনূদিত রচনার সংখ্যা ১৫৭।



রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালা



'আত্মনিবেদনে' অনুবাদ কর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে অনুবাদক বলেছেন— 'এটি কেবল পদ্যানুবাদ নয়, এতে মিল, অন্তঃমিল ও যতি-গতির সঙেগ সঙেগ মূলের ছন্দও অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা আছে। বহুক্ষেত্রে গানের মূল 'ধুন'ও সুরক্ষিত। আর ভাব তো পতিব্রতার মতো অনুগামী রয়েছেই। তা নাহলে হিন্দীতে যখন অনুবাদের অভাব নেই, তখন অকারণ সময় ও শ্রমের অপব্যয়ের আগ্রহে লাভ কি? ..... যাই হোক এটি একটি বিনীত প্রয়াস মাত্র।'

হংসকুমার তিওয়ারীজী রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত অনুবাদক। রবীন্দ্রসঙগীতের ও অনুবাদকে এবং বাংলার মতোই সুর নিয়োজকও। সুতরাং তাঁর অনুবাদ কর্মটির উৎকর্ষ এবং সাফল্য বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে কোন বাধা নেই।

উল্লিখিত অনুবাদগুলি সবই খড়ীবোলীর। খড়ীবোলীতে গীতাঞ্জলির আর একটি অনুবাদ শীঘ্রই লখনাউ থেকে প্রকাশিত হবে। অনুবাদক উপলব্ধ যাবতীয় অনুবাদ এবং রবীন্দ্রানুরাগী ব্যক্তির সহায়তায় অনুবাদ কর্মটিকে চূড়ান্ত রূপদানে ব্যস্ত আছেন। তাঁর অনুবাদও মান ও মাধুর্যের বিচারে উল্লেখযোগ্য হবে আশা করা যায়।

১৯৬৬ সালে কলকাতার 'মিথিলা সাংস্কৃতিক পরিষদ' প্রকাশিত গীতাঞ্জলির মৈথিলী অনুবাদও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুবাদক জনৈক 'শ্রুতধর'। বাংলা গীতাঞ্জলির ১৫৭টি রচনাই মৈথিলীতে অনূদিত। গ্রন্থারম্ভে 'মিথিলা ভাষার সাহিত্য ও গীতাঞ্জলির অনুবাদ' বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচনার আধ্যাত্মিক উৎস যে বেদ-উপনিষদ্ সেকথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন 'শ্রুতধর'। উপনিষদের—

"ইহ চেদবীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহানবদী মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।।"

—কেনোপনিষদ, খন্ড-২, মন্ত্র ৫।

উদ্ধৃত করে তার সঙেগ গীতাঞ্জলির ২৪ নং (যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু, এবার এ জীবনে' প্রভৃতি) গানের ভাবের সাম্য নির্দেশ করেছেন। গানটির মৈথিলীরূপ হল—প্রারম্ভিক তিন পংক্তি)—

দর্শন জঁ নে অহাঁক ভেটত প্রভু।
এহিবের এহি জীবন মেঁ।
তখন অহাঁ কে পাবি সকব নহিঁ,
রহ এ বসল ঈ মন মেঁ।

জহি সঁ হম নহিঁ বিসরি সকী, ব্যাকুলা ভয়ে স্বপ্ন শয়ন মেঁ।"

রবীন্দ্রনাথ বেদ-উপনিষদ্ থেকে ভাব কুসুম চয়ন করে অঞ্জলি ভরে বিশ্ব-পুরুষ বিশ্বাত্মারয় উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর অঞ্জলির রসাস্বাদন ও মাধুর্য এবং সৌরভের অনুভূতি এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। এই হল শ্রুতধরজীর অভিমত।

গীতাঞ্জলির 'ব্রজভাষা'য় অনুবাদ করেছেন 'শ্রীআগরওয়াল'। মথুরা থেকে মুদ্রিত হয়ে বইটি এতদিনে প্রকাশিত হয়ে গেছে মনে হয়। এই প্রসঙেগ আরও উল্লেখযোগ্য হল 'ভোজপুরী ভাষায়' গীতাঞ্জলির অনুবাদ। অনুবাদক রাজেশ্বর প্রসাদ। জামশেদপুরের অধিবাসী। তিনি ইংরেজি গীতাঞ্জলির গানগুলিই অনুবাদ করেছেন, তবে প্রত্যেকটি গানের মূল রূপ অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। অনুবাদের প্রয়াস বেশ প্রশংসনীয়।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাহিত্যকৃতির অনুবাদ হলেও গীতাঞ্জলির বিবিধ এবং বিচিত্র হিন্দী অনুবাদ স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা বিষয়। গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের সবদেশে সবভাষার মানুষের কাছে পরম আপনজন, অসময়ের বন্ধুরূপে পৌছে দিয়েছে, তেমনি হিন্দী ভাষী অঞ্চলের নানা ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার মানুষের কাছে ও 'রবীন্দ্রনাথ' পরমকল্যাণময় পথপ্রদর্শক, দুঃখের সান্ত্বনা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের যুগোচিত নব উদ্গাতা রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছেন গীতাঞ্জলি অনুবাদের মাধ্যমেই। তাঁর কবিতা মূল এবং অনুবাদ হিন্দীভাষী অঞ্চলে পড়া হয়, রবীন্দ্রসঙগীত গাওয়া হয়—তাতে সাহিত্যের আনন্দ যেমন মেলে তেমনি জীবন ও জগতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আস্থা প্রতিধ্বনিত হয়। তাই গীতাঞ্জলি আজ হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের অপরিহার্য অঙগস্বরূপ, নির্মীয়মাণ নবীন সংস্কৃতির স্তম্ভও।

দ্রষ্টব্য—

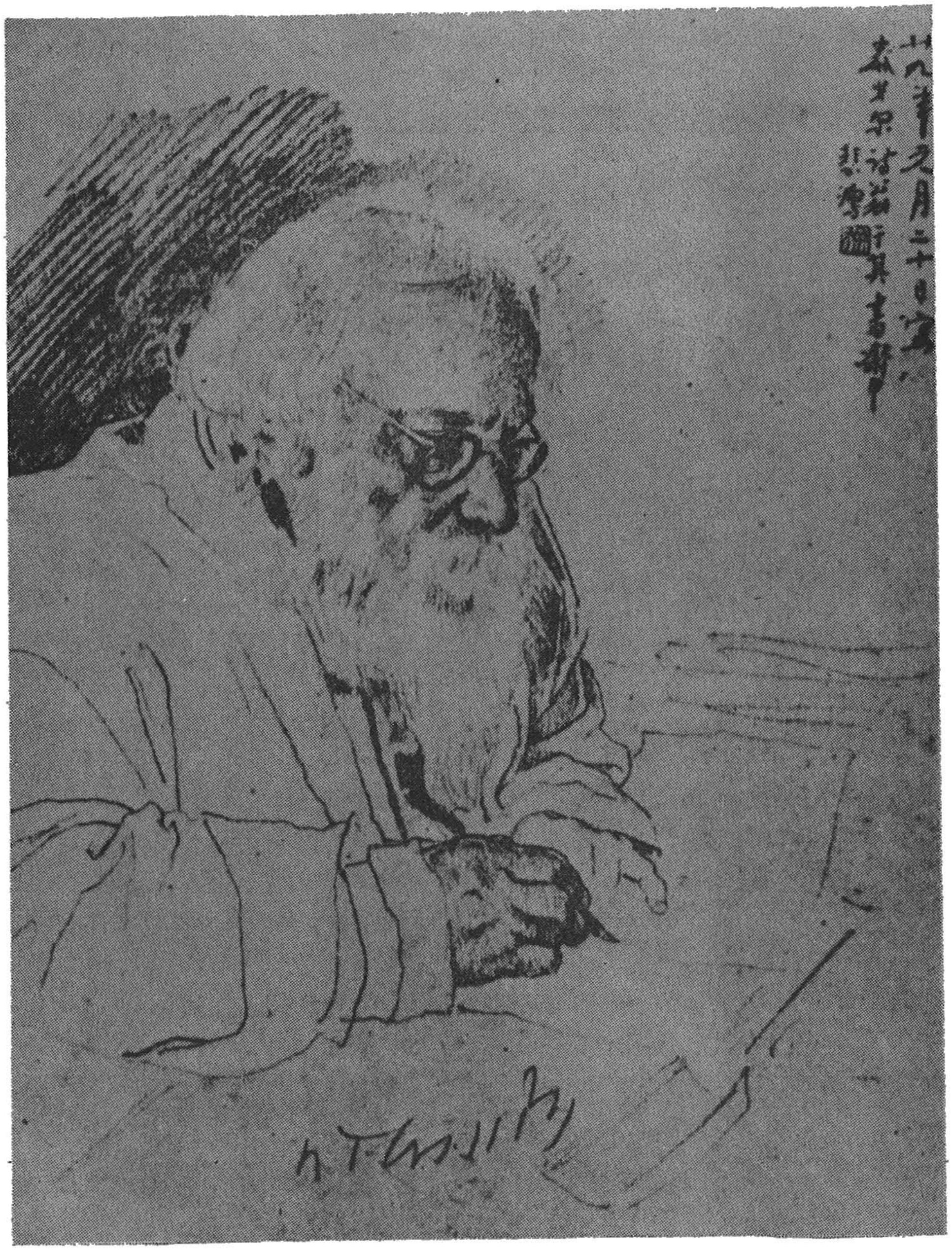
১. বর্তমান লেখকের 'হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৮৯), পৃঃ ৫৪১।
—বিশ্বভারতী গবেষণা-প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন।

২. সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে গিয়ে জানতে পেরেছি তেলেগু ভাষায় গীতাঞ্জলির ১৮টি অনুবাদ হয়েছে। হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বললেন ১২টি কিন্তু তেলেগু বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের মতে ১৮টিই ঠিক।

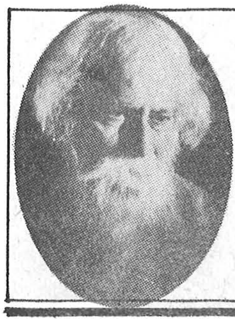
৩. ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজি গীতাঞ্জলির কম করে ৩৮টি মুদ্রণ হয়েছে।

৪. স্মরণীয়-রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ 'কুমুদিনীর' আলোচনা প্রসঙেগ প্রেমচাঁদ বলেছিলেন—'মাসখানেকের চেষ্টায় বাংলা শিখে নেওয়া যায়, সুতরাং বাংলা শিখে মূল গ্রন্থ পাঠই সমীচীন মনে হয়।'

[redacted]



রবীন্দ্রনাথ। ১৯৪০
জু. পিয়োঁ-অঙ্কিত



পুঁথি-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ

ত্রিপুরা বসু



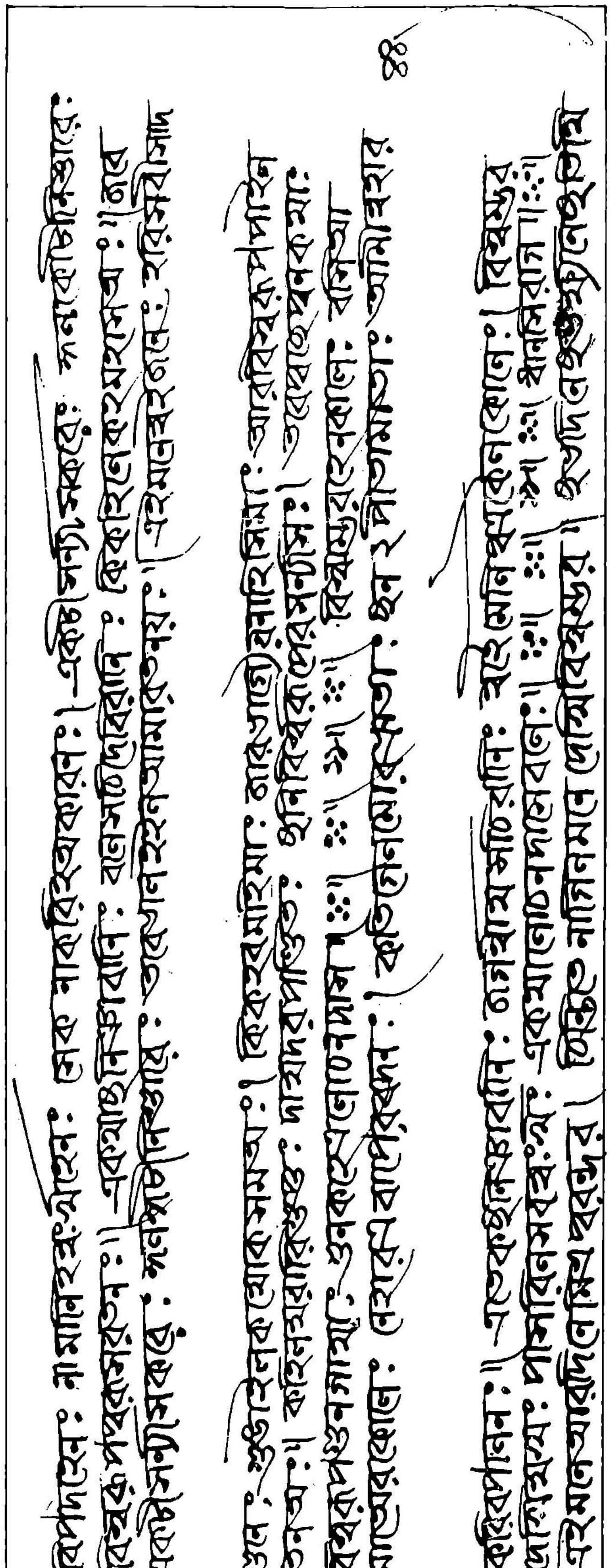
পুঁথি' শব্দের সাধারণ অর্থ বই হলেও একালে মূলত হাতে লেখা প্রাচীন পান্ডুলিপিকেই 'পুঁথি' বলা হয়। সংস্কৃত 'পুস্তিকা' শব্দ থেকে প্রাকৃতে 'পুত্থিয়া' ও পরে বাংলায় 'পুথি' এবং স্বতোনাসিক্যীভবনের ফলে 'পুঁথি' শব্দের আবির্ভাব। হিন্দি, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, মৈথিলী, সিন্ধি ও ওড়িয়া ভাষায় 'পোথী' বানানটি অনুসৃত। অসমীয়াতে 'পুথী' ও 'পুথি' উভয় বানানই প্রচলিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, কবিকঙ্কণ চন্ডী ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' 'পুঁথি' এবং বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' 'পুঁথি' বানানটি অনুসৃত। আধুনিক বাংলায় হুতোম প্যাঁচা 'পুঁথী' বানানটি ব্যবহার করলেও রবীন্দ্রনাথ 'পুঁথি' বানান ব্যবহার করেছেন। শব্দকোষকার পন্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুঁথি', 'পুঁথী' 'পুথি' ও 'পুথী' এই চারটি বানানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এর অর্থনির্দেশ করেছেন এইভাবেঃ ১. (প্রায়ই প্রাচীন) হাস্তলিখিত পুস্তক, ২. গ্রন্থ বা পুস্তক, ৩. সন্দর্ভ। প্রথমোক্ত অর্থটিই সমধিক প্রচলিত ও ব্যবহৃত।

বর্তমানকালে সভ্য মানুষের জীবনে বইয়ের যেমন অসাধারণ ভূমিকা, সেকালেও জীবনযাপনের নানা অনুষঙ্গে হাতে লেখা পুঁথি ছিল অবিচ্ছেদ্য জীবনোপকরণ। বাংলা পুঁথি ও প্রাচীন নথিপত্রের বিশিষ্ট সংগ্রাহক ও পরিচায়ক পন্ডিত ডঃ পঞ্চানন মন্ডল বলেছেন, "বৈষ্ণবের আখড়ায় থাকতো চৈতন্যজীবনী ও পদাবলী, বাউলের আখড়ায় থাকতো মীন-গোর্খের হেঁয়ালী, মাঠে-ঘাটে ছিল শাক্তপদাবলী, মঙ্গলকাব্যের মন্দিরা বাজতো সমাজের সকল স্তরে। কালিরাম, কৃত্তিবাস পূজিত হতেন ঘরে ঘরে। কোকশাস্ত্র, কবিরাজী বা বৈদ্যকের পুঁথি, হেকিমি তিব্‌তারও প্রচলন ছিল হাতে লিখে লিখে। ভাট, দৈবক, ঘটক মহাশয়দিগের বগলে ফিরতো হাতে লেখা গ্রন্থ কুলজী, পঞ্জী এসবের। সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে পুরাণপাঠ ও কথকথা। তাও হত হাতে লেখা গ্রন্থ থেকে (ডঃ পঞ্চানন মন্ডল, 'বাংলা পুঁথিঃ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগ,' সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৭৫ সংখ্যা ১)।" এই উদ্ধৃতি থেকেই বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না, বাঙালী জাতি সেই কোন সুদূর অতীতকাল থেকেই তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে হাতে লেখা পুঁথিকে সংযুক্ত করে নিয়েছিল। চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, মঙ্গলকাব্য , পাঁচালী, পদাবলী—সবরকমের পুঁথির মধ্যেই বাঙালীর ঐতিহ্যলালিত জীবন ও সভ্যতার যথার্থ পরিচয় নিহিত আছে। তাই হয়তো বাঙালী সভ্যতা ও কৃষ্টিকে অনেকাংশে পুঁথি-নির্ভর সভ্যতা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

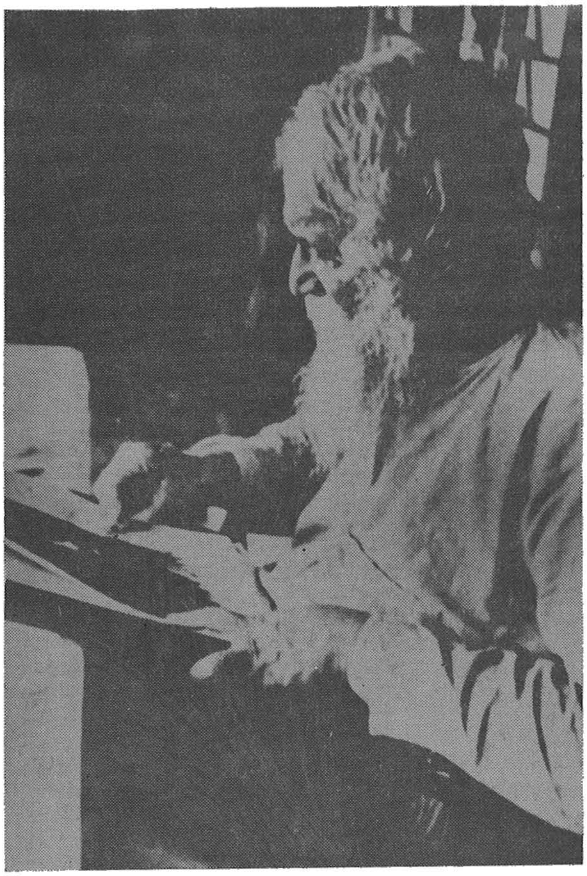
বিচিত্র পুঁথির সাহায্যেই বাঙালীর শত শত বৎসরের ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার অবিচ্ছিন্ন ধারাটি পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। তাই বঙ্গীয় জীবন ও সভ্যতার যথাযথ পরিচয় পেতে হলে এদেশের পুঁথিসাহিত্যের সংগ্রহ, আলোচনা ও গবেষণা নিতান্তই জরুরী। পুঁথি ইতিহাস রচনার এক মূল্যবান লিখিত উপাদান। এই পরম সত্যটি উপলব্দি করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেন এবং দেশের আপমর জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা উপাদান সংগ্রহ ও আলোচনা এবং বিচিত্র বঙ্গসংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে তার অতুলনীয় উদ্যোগে আমরা বিস্মিত হই। তিনি ভেবেছিলেন, "বাংলার নিজস্ব আর্ট আইডিয়া ক্রমেই বিদেশীয় প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আর কিছুদিন

পরে আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে।" তাই দেশীয় জনকৃতির বহুবিধ উপাদান সংগ্রহে তাঁর আজীবন উদ্যোগের অন্তছিল না। কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'রবিপ্রদক্ষিণ' বইতে একস্থানে লিখেছেন, শিলাইদহে পদ্মাবক্ষে থাকার সময় নক্‌শী কাঁথা, পাটের তৈরী শিকা, আলপনার নকশা থেকে শুরু করে খড়ের চালা দেওয়া মাটির বাড়ির মডেল ইত্যাদি আরো কত কি তিনি সংগ্রহ করেছেন। মেদিনীপুরের কৃষিজীবী মানুষদের অপরূপ শিল্পকর্ম নকাশিবড়ি সংগ্রহের তাঁর উদ্যোগের অন্ত ছিল না। বঙ্গসংস্কৃতির মূল্যবান নিদর্শন হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহেও তাঁর উদ্যোগ অতুলনীয়। তাঁর সংগৃহীত বিরল বাংলা পুঁথি 'যোগীর গান' বিশ্বভারতী ১৯৪৯-এ প্রকাশ করেছেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দ লেখা তাঁর 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' থেকে এই বেদবাক্যটি উল্লেখ করি, "দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায় প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটীরে.... তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই— কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিষমাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো, তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো.... পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো।" ১৩১৩ বঙ্গাব্দে লেখা "সাহিত্য সম্মিলনে' তিনি লিখেছেন, "প্রদেশের উপভাষা, ইতিহাস, প্রাকৃত সাহিত্য, লোকবিবরণ....প্রাচীন দেবালয়, দীঘি ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের ফটোগ্রাফ এবং প্রাচীন পুঁথি, পুরালিপি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।" এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য, 'বিহার হেরাল্ড' পত্রিকার ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩-এ প্রকাশিত, পুঁথি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র। চিঠিটির অংশবিশেষ, "Realising the urgent necessity of preserving old manuscripts of Sannskrit and Vernacular literature from destruction and disappearance from India, Viswa Bharati has under taken to edit and utilise them for public benefit..... It is needless to say that any old manuscripts sent to us that have a literary of historical importance, will be gratefully received by our institution and preserved in Viswa Bharati library in Santiniketan with care. (দ্রঃ পুঁথি পরিচয়, ৪র্থ খন্ড, শ্রীপঞ্চানন মন্ডল, ফেব্রুয়ারী ১৯৮০, বিশ্বভারতী। পত্রটির শীর্ষনাম ঃ Letter to the editor in quest of rare manuscripts)।"

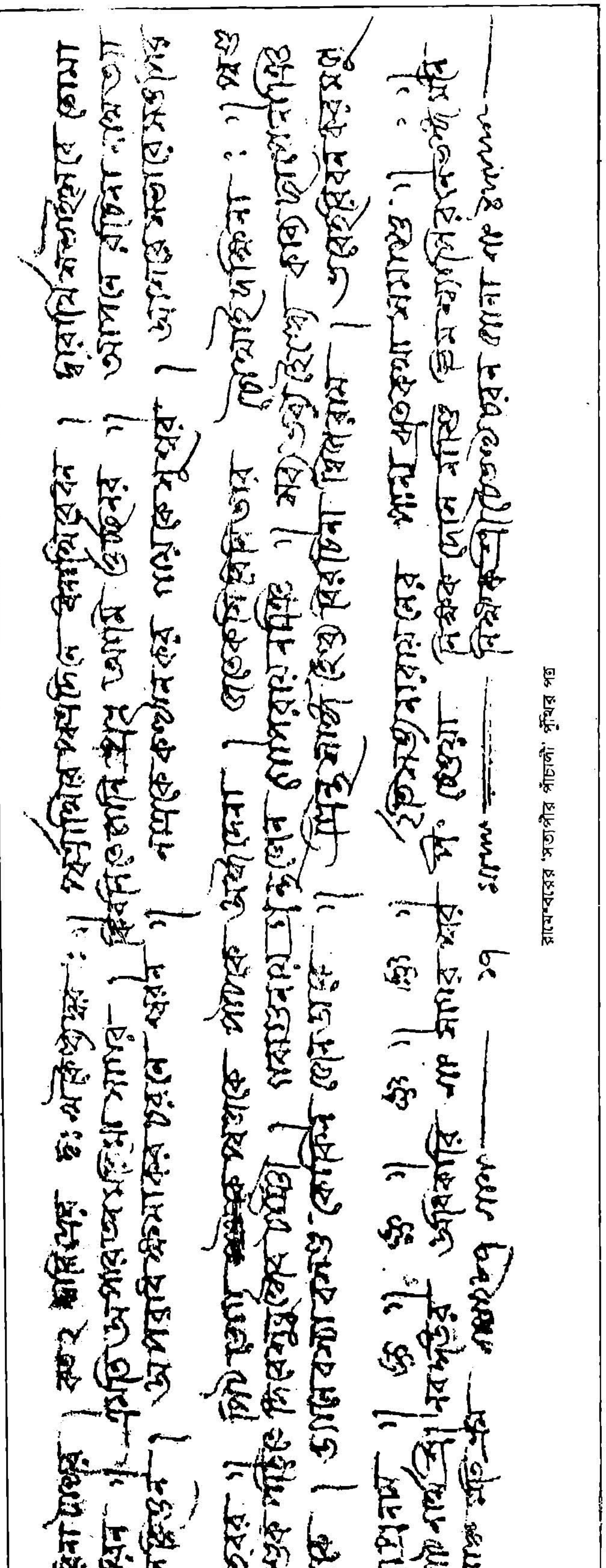




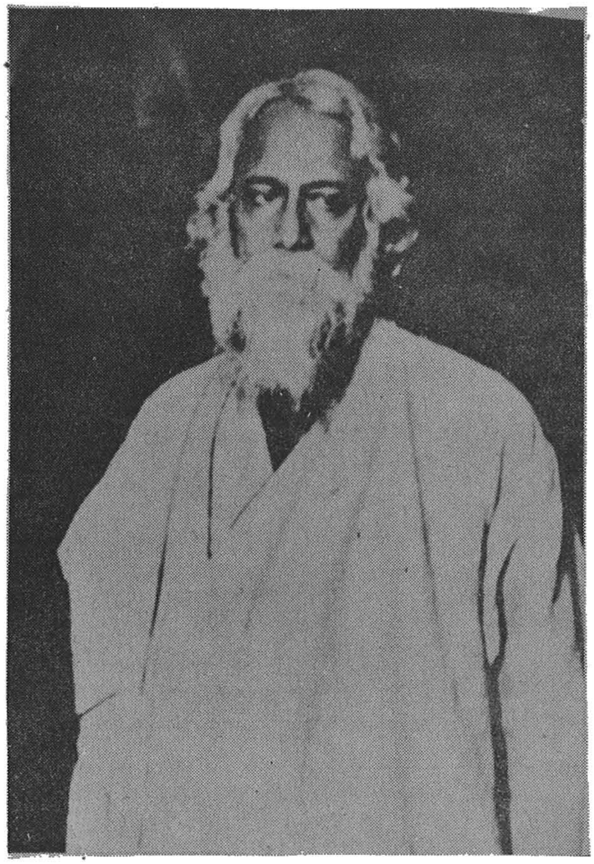
লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' পুঁথির পত্র



বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে ডঃ পঞ্চানন মন্ডল লিখেছেন, "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় পত্তন করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হস্তলিখিত পুরাতন গ্রন্থ সংগ্রহের উদ্যোগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আশা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনে সেকালের ও একালের বিশ্ব-সংস্কৃতির চর্চা হবে এবং তাঁর এই ভাবনা থেকেই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। সেকালের ভারতীয় সংস্কৃতির উপকরণ পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যেই মুখ্যত নিহিত আছে তার সন্ধান তিনি ভালোভাবেই জানতেন। বিশ্বভারতীর কর্মধারার একটি প্রধান অংশ ছিল, দেশের নানা স্থান থেকে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও আলোচনা (বাংলা পুঁথিঃ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগ, সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৭৫, সং-১, পৃঃ-২৫)।" বিশ্বভারতীর পুঁথিবিষয়ক কর্মোদ্যোগের বিশিষ্ট ফসল 'পুঁথি পরিচয়' গ্রন্থমালার প্রথম খন্ডের (প্রকাশকাল: আষাঢ় ১৩৫৮, বিশ্বভারতী) মুখবন্ধে বিদ্যাভবনের তাৎকালিক অধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখেছিলেন, "বিশ্বভারতীর কর্মধারায় একটি প্রধান অংশ ছিল দেশের নানাস্থান থেকে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও আলোচনা। আমাদের প্রাচীন ইতিহ্য যে বহু পরিমাণে ঐসব পুঁথিপত্রের মধ্যে নিবন্ধ আছে, সেকথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। সেই কারণেই অবসরমত পল্লীগীতি সংগ্রহে তিনি নিজে যত্নবান হয়েছিলেন, আশ্রমের কর্মীদেরও পুঁথিপত্র সংগ্রহের কাজে উৎসাহিত করেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর সুসংবদ্ধভাবে পুঁথি সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়। একাজে সহায়তা করেন ত্রিবান্দ্রমের পন্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী। তিনি কিছুকাল শান্তিনিকেতনে অবস্থান করেন ও নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে বহু সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করেন। পরে দক্ষিণ ভারত থেকেও গ্রন্থাক্ষরে লিখিত প্রায় আড়াই হাজার পুঁথি সংগ্রহ করা হয়। নেপাল রাজকীয় পুঁথিশালা থেকেও কিছু পুঁথির প্রতিলিপি আনানো হয়।....."



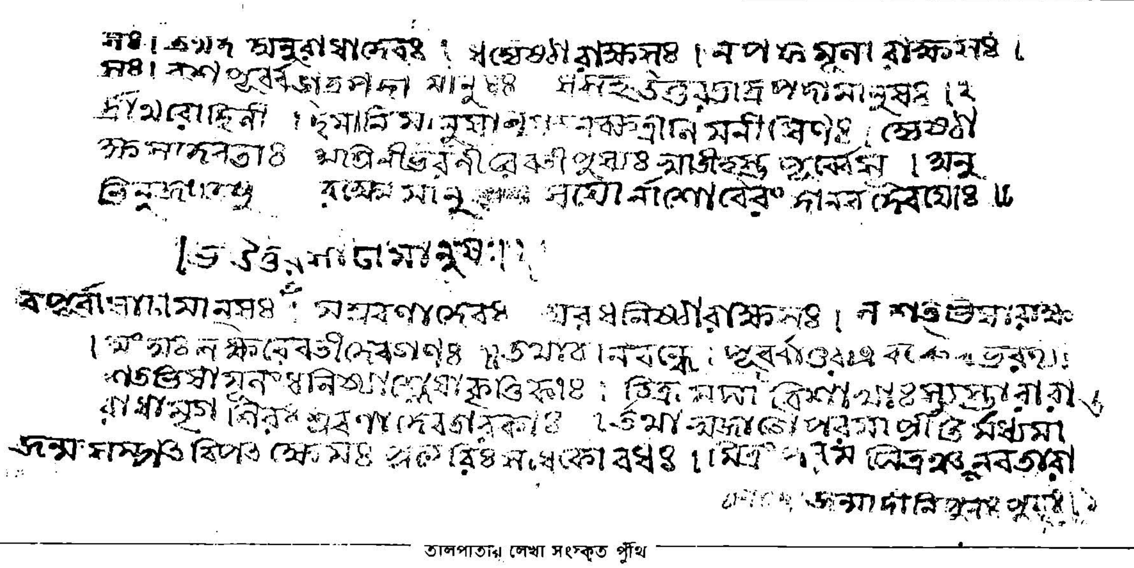
রামেশ্বরের 'সত্যপীর পাঁচালী' পুঁথির পত্র



১৯২৩-এ বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগ স্থাপিত হয়। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজে সংগ্রহের কাজ করে আসছিলেন তার আগে থেকেই। পুঁথি বিভাগ সুসংবন্ধভাবে পুঁথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সম্পাদনা-প্রকাশনার কাজ শুরু করে রবীন্দ্রনাথেরই নির্দেশক্রমে। ত্রিবান্দ্রম থেকে আগত পন্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং পরবর্তীকালে অধ্যাপক পঞ্চানন মন্ডলের উদ্যোগে বিশ্বভারতী পুঁথি গবেষণার ক্ষেত্রে যে ধরনের বিজ্ঞানসম্মত কাজ করে চলেছেন তা এদেশে তো বটেই, সবদেশেই পান্ডুলিপিচর্চার ক্ষেত্রে এক আদর্শবিশেষ। লোকসংস্কৃতি সংগ্রহে বিশ্বভারতীর যেসব কার্যক্রম আছে, তার প্রথম ধারাটিই হল হস্তলিখিত পুরাতন পুঁথির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণা। তুলট কাগজ, তালপাতা, ভূর্জপত্র বা চামড়ার উপর লেখা যে-কোন ভাষার পুঁথি বিভিন্ন বাড়ি, টোল, মন্দির বা যত্রতত্র অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছে। সেগুলির সংগ্রহ এক জাতীয় কর্তব্য। প্রাচীন পুঁথি ছাড়াও হাতে লেখা দলিল-নথিপত্র, চিঠিপত্র সর্বকিছুই সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে মূল্যবান। সে ব্যাপারেও রবীন্দ্র আদর্শ অনুসারী বিশ্বভারতী অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি দিক বিষয়ে আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টির অবসান ঘটিয়েছেন। কিন্ত পুঁথিসাহিত্যের বিষয় ও তার সাহিত্যমূল্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি নিজস্ব বক্তব্যটিকেই উপস্থাপিত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯২৩-এ রচিত 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'কাব্য: স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' রচনায় চন্ডীমঙ্গল প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাটানৈপুন্য থাকিতে পারে কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়?.... ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্ত কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি কবিত্ব হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে' সে তো আরো কবিত্ব।" অন্যত্র বলেছেন, "কবিকঙ্কণের কমলেকামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তী গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে যে আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়।"

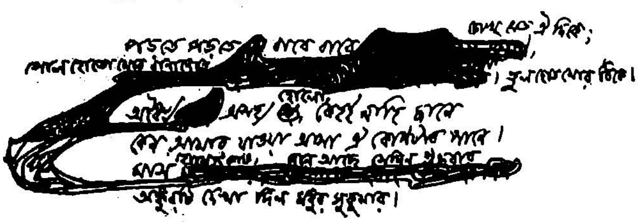
দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ প্রকাশের পর 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩০৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বইটির একটি আলোচনা প্রকাশ করেন। মনে হয়, মঙ্গলকাব্য বিষয়ে তাঁর প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সূত্রই এই বইটি। 'অন্নদামঙ্গল' ছাড়া আর কোন মঙ্গলকাব্যের পুঁথি তখনও মুদ্রিত হয়নি। পরবর্তীকালে মুকুন্দরামের 'চন্ডীমঙ্গল' প্রকাশিত হয় বঙ্গবাসী কার্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বঙ্গবাসী সংস্করণের চন্ডীমঙ্গল থেকে তিনি কালকেতু ফুল্লরা

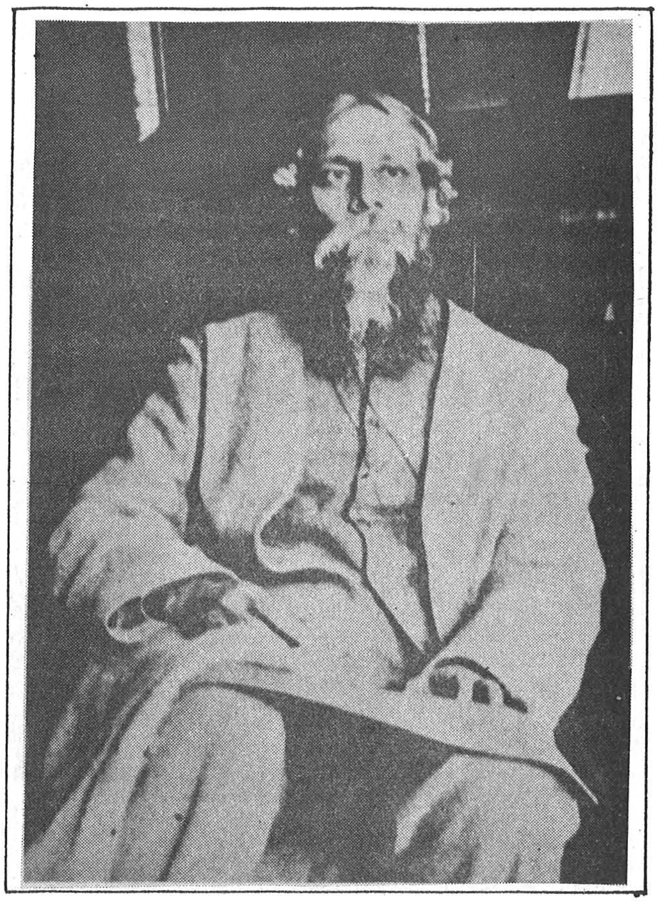


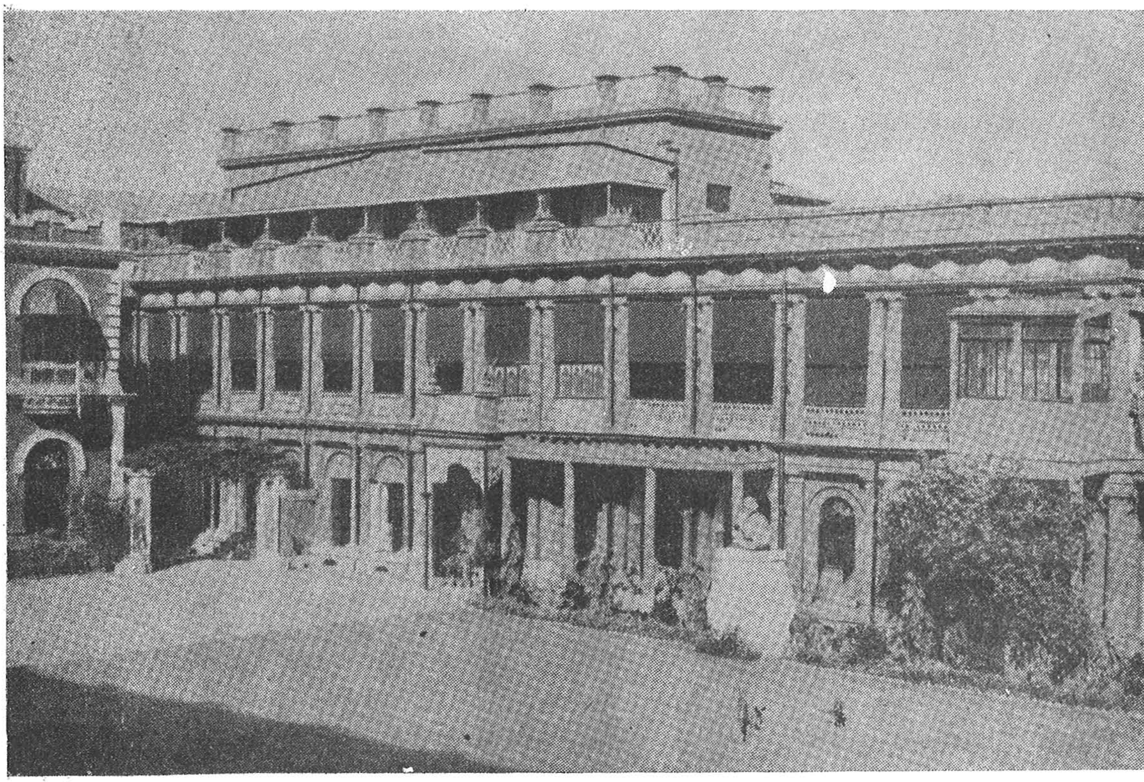
তালপাতায় লেখা সংস্কৃত পুঁথি

ও ধনপতি উপাখ্যানটি অবগত হন। এইসব কাহিনী ও তথ্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আর একটি স্বকীয় বক্তব্য 'কালান্তরের' 'বাতায়নিকের পত্র' রচনায় লক্ষণীয়: "একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃংখলতার সময় ভীত, পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়ে শক্তিরই স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কণ চন্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে অন্যায়কারিণী, ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পরাভব গানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হল।" আবার 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যসৃষ্টি'তে লিখলেন, "মুকুন্দরামের চন্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল...বাংলার ছোটো ছোটো পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস (১৩১৪)।" ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, তাৎকালিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থের ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁকে লিখতে দেখা যায়, "....এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেই বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পরিণতি আলোচনাকার্যে এই বইখানি বিশেষ সহায়তা করতে পারবে....।"

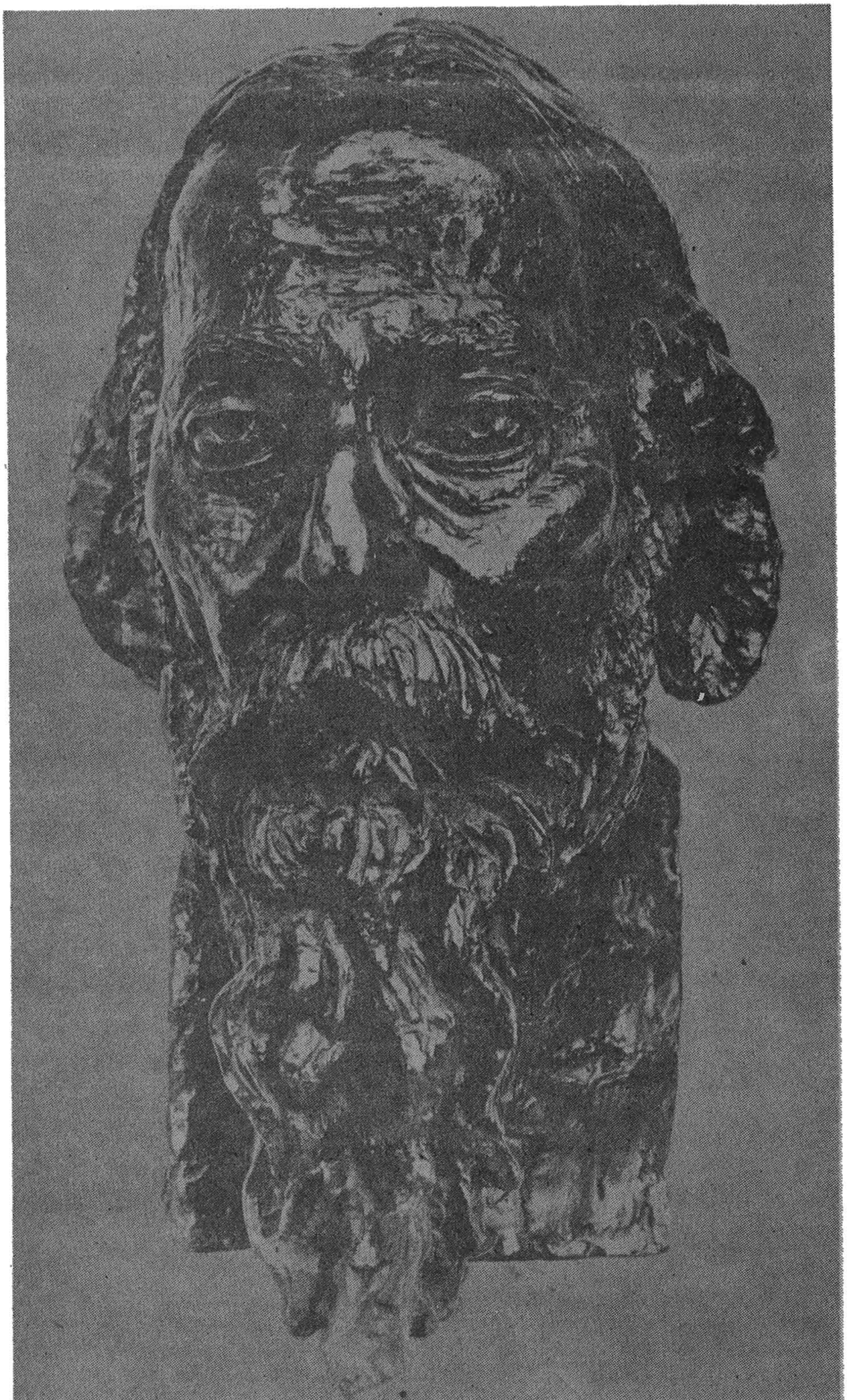
যাই হোক না কেন, প্রাচীন পুঁথির ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জনভাবনা ইত্যাদির দিক থেকে গুরুত্ব অনুভব করে অন্তত এদিকে তিনি যদি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করতেন, তাহলে পুঁথিসাহিত্যের আরো অনেক ক্ষতিই হয়ে যেতো।





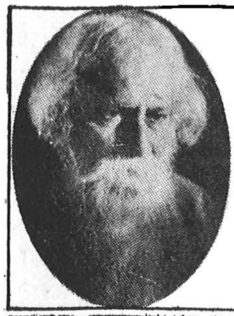


জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি



রবীন্দ্রনাথ

জ্যাকব এপস্টাইন-কৃত, ১৯২৬



রবীন্দ্র-রচনায় লোক-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার

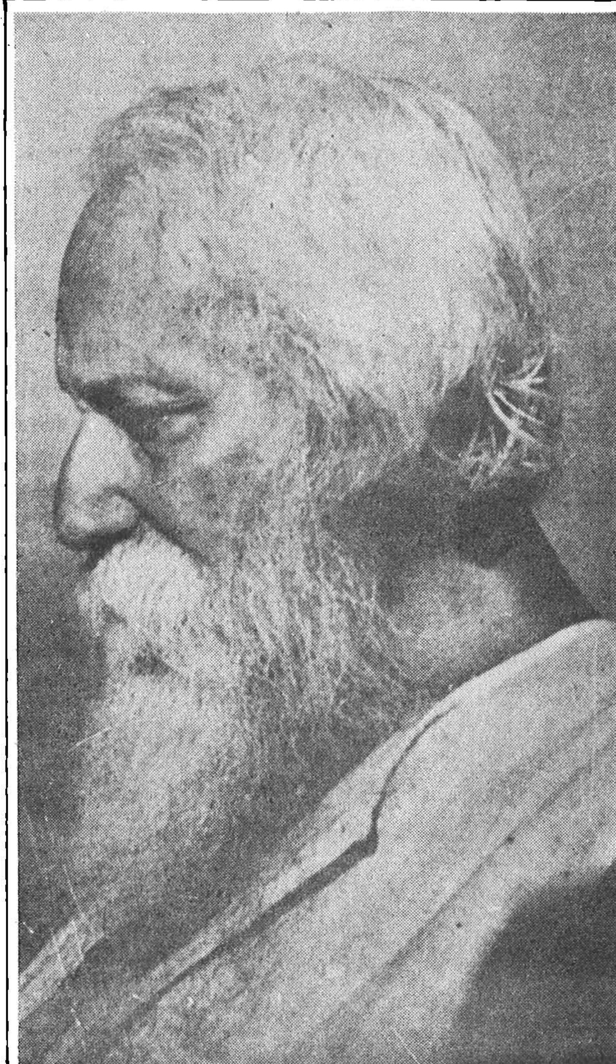
মানস মজুমদার

'কাবুলিওয়ালা' (১২৯৯) গল্পের মিনির কথা মনে আছে ? গল্পের শুরুতে যে তার লেখক পিতাকে দুরন্তপনায় বিব্রত করে তুলেছিল ? লেখক পিতার পায়ের কাছটিতে বসে নিজের দু'টি হাঁটু আর হাত নিয়ে 'অতিদ্রুত উচ্চারণে' 'আগড়ুম বাগড়ুম' খেলায় মেতে উঠেছিল ? 'আগড়ুম বাগড়ুম' বাংলার ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় খেলা। খেলাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে একটি ছড়া। ছড়াটিতে পাই বিবাহ-যাত্রার বর্ণনা। লোকসংস্কৃতির দু'টি দিক,—খেলা ও ছড়ার উপস্থিতি এখানে। প্রথমটি খেলাধূলাকেন্দ্রিক লোক-সংস্কৃতির উদাহরণ। দ্বিতীয়টি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিক নিদর্শন।

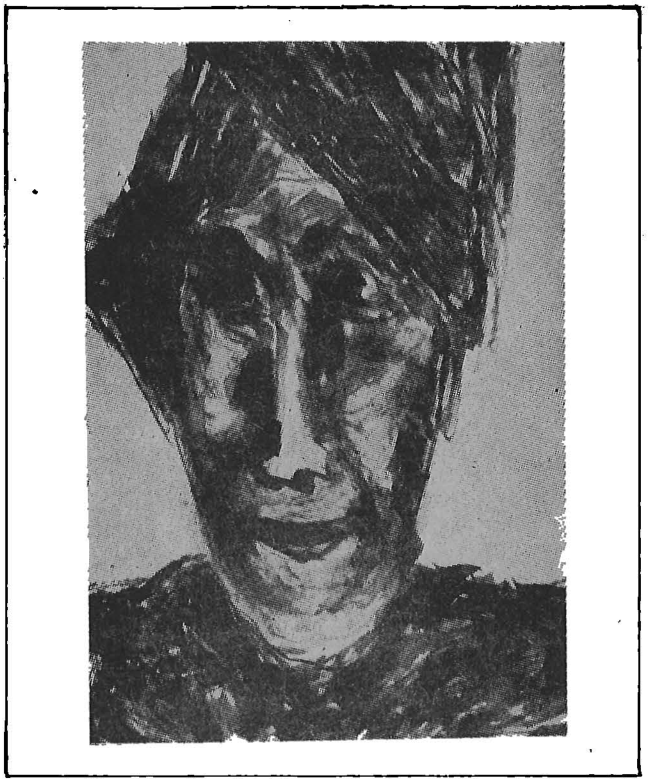
খেলার কথায় মনে পড়ছে, 'শারদোৎসব' (১৩১৫) নাটিকায় তৃতীয় বালকের উক্তিতে 'নৌকা-বাচ' খেলার উল্লেখঃ "কী বল ঠাকুর্দা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকা-বাচ করতে যাব। বেশ মজা!" 'নৌকা-বাচ' অর্থাৎ, 'নৌকা-বাইচ'। পূর্ববঙ্গ সালের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন রবীন্দ্রনাথ। শারদোৎসবের একটি অঙ্গ হয়ে উঠলো নৌকা-বাইচের খেলা। ঠাকুরদাদার কন্ঠ-নিঃসৃত 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান' গানে তারই ভিন্নতর অভিব্যক্তি। 'রক্তকরবী'-তে (১৩৩৩) নন্দিনীর উক্তিতে পাওয়া যায় 'বাচ-খেলা' আর 'তলোয়ার খেলা'র উল্লেখঃ ".....অনুপ আর উপমন্যু। ....দুই ভাই ...আষাঢ়চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। মরে যাই, ওদের এমন দশা কে করলে। ওই-যে দেখি শকুলু, তলোয়ার খেলায় সব্বার আগে পেত মালা।" পুঁজিবাদী যন্ত্রসভ্যতার শোষণ পীড়নের বীভৎস স্বরূপ-চিত্রণে লোকসংস্কৃতির ব্যবহার ঘটলো। যক্ষপুরী এই মানুষগুলির জীবনে নিয়েছে নিষ্ঠুর ঘাতকের ভূমিকা। তাদের সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের বিনাশ ঘটিয়েছে। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ততাকে হত্যা করেছে। নিরানন্দময় হয়ে উঠেছে তাদের জীবন। নৌকা-বাইচ খেলার আনন্দ ও উত্তেজনার শরিক হওয়ার সুযোগবঞ্চিত তারা। তলোয়ার খেলার আসর থেকেও নির্বাসিত তারা। দু'টি খেলার স্বল্পতম উল্লেখে তাদের অতীত ও বর্তমান জীবনযাত্রার বৈপরীত্যটুকু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

....২....

বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত ছেলেভুলানো ছড়াগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মমত্ব সুবিদিত। ছেলেভুলানো ছড়ার রস-সৌন্দর্যের প্রথম ব্যাখ্যাতা তিনি। ১৩০১ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় লিখলেন 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ।' আর ঐ সনের মাঘ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় লিখলেন 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ, সেই সঙ্গে উপহার দিলেন এক প্রস্থ ছড়া-সংগ্রহ। স্মরণযোগ্য, শেষোক্ত প্রবন্ধে 'আগড়ুম বাগড়ুম' ছড়াটির বেশ কয়েকটি কথান্তর সন্নিবিষ্ট। অনুমান করা চলে, 'কাবুলিওয়ালা' নামক বাৎসল্যরসের গল্পটি যখন লেখা হচ্ছে, তখন তাঁর মনের মধ্যে চলেছে ছেলেভুলানো ছড়া বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার প্রস্তুতি।



শুধু কী তাই ? এই সমস্ত ছড়ার কোনো কোনোটি কী তাঁর কবি-মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় নি ? প্রসঙ্গত 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান' ছড়াটির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে কবির স্বীকারোক্তিটুকু ঃ ..."এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই।" 'শিশু' (১৩১৬) কাব্যের 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতায় এ ছড়ার অনুষঙ্গে ছেলেবেলার দিনগুলিতে ফিরে



যান কবি। বর্ষণমুখর মেঘলা সন্ধ্যায় ছড়াটির মোহসঞ্চারী প্রভাবের কথা স্মরণ করেন।

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর' ছড়াটিও কী তাঁকে সমানভাবে আলোড়িত করেনি? পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তিনি ছড়াটির যে আলোচনা করেছিলেন, তা আজও সমান স্বাদু ও তৃপ্তিকর। জীবনের প্রান্তসীমায় 'সেঁজুতি'র (১৩৪৫) 'নতুন কাল' (১৩৪৪) কবিতায় ধুয়াপদের মতো ব্যবহৃত ঐ ছড়া-পংক্তি পেলো নতুন তাৎপর্য। প্রবহমান কালের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'ল ঐ ছড়া-পংক্তিতে।

'প্রহাসিনী'র (১৩৪৫) 'রঙ্গ' ছড়াটি সুপরিচিত 'এ তো বড়ো রঙ্গ' ছড়াটির অনুকরণে রচিত। পার্থক্য হ'ল, মূল ছড়াটি প্রশস্তিমূল্য, কিন্তু দ্বিতীয় ছড়াটি শ্লেষতীক্ষ্ণ।

'ছুটি' (১২৯৯) গল্পে কাঠের গুঁড়ি ঠেলার সময় ছেলেদের মুখে ধ্বনিত হয় শ্রমের ছড়াঃ "মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।" শ্রমের ছড়া এখানে সঙ্ঘ-শক্তির পরিচায়ক।

'ছড়া'-র (১৩৪৮) ৬ সংখ্যাক ছড়ায় লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ছড়া-পংক্তিকে অনায়াস-নৈপুণ্যে ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথঃ

"আতা গাছে তোতাপাখি, ডালিমগাছে মৌ,
হীরেদাদার মড়ুমড়ে থান, ঠাকুরদাদার বৌ।
....
খোকা গেছে মোষ চরাতে, খেতে গেছে ভুলে,
কোথায় গেল গমের রুটি শিকের' পরে তুলে।
....
কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড়পুতুলের বিয়ে,
বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিয়ে।
ছাইয়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকে পাড়ার খেঁকি কুকুর,
পান্তিহাটে বেতো ঘোড়া চলে টুকুর টুকুর।
তালগাছেতে হুতোমথুমো পাকিয়ে আছে ভুরু,
তক্তি মালা হড়ুম বিবির গলাতে সাত পুরু।"

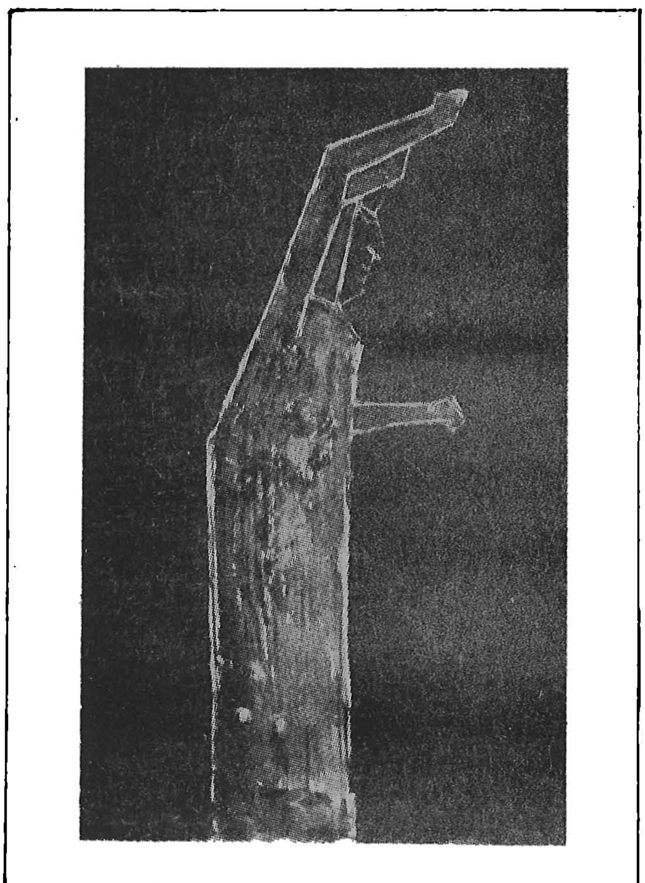
'খাপছাড়া' (১৩৪৩), 'ছড়ার ছবি' (১৩৪৪), 'ছড়া' (১৩৪৮) প্রভৃতি ছড়া-সংকলনের প্রকাশ তো আকস্মিক নয়। সাহিত্যের এই শাখাটির প্রতি তাঁর আশৈশব অনুরাগ। সযত্ন লালন ও পরিচর্যায় শাখাটিকে তিনি সমৃদ্ধ করে তুললেন। ছড়া-কবিতার মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটালেন। কিন্তু থাক সে কথা।

....৩....

লোককথার প্রতিও তাঁর সম-অনুরাগ। 'কড়ি ও কোমল'-এর (১২৯৩) 'উপকথা'-য় রোমান্টিক কবিচিত্তের ব্যাকুলতা, বিষাদময়তা ও সুদূরপিপাশাসূত্রে রূপকথা প্রসঙ্গের আবির্ভাব ঘটেঃ

"রাজপুত্র অবহেলে কোন্ দেশে যেত চলে,
কত নদী কত সিন্ধু পার।
সরোবর ঘাট আলা মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশভার।
সিন্ধুতীরে কত দূরে কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।
হাসি তার মণিকণা কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।
সাত ভাই একত্তরে চাঁপা হয়ে ফুটিতরে
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব একত্রে আছিল সব
দুটি ভাই সত্য আর ভুল।"

কবিতাটিতে বাংলার সুপরিচিত দু'টি রূপকথার সাহায্য নেন কবি। প্রথমটি 'ফকিরচাঁদ' গল্প। দ্বিতীয়টি 'সাত ভাই চম্পা'-র গল্প।



রাজধানী কলকাতার ইঁট-কাঠের ভিড়ে হাঁপিয়ে ওঠে যে বালিকা 'বধূ'টি, সদ্য ফেলে আসা গ্রাম-জীবনের কথা ভেবে যে ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হয়, তার সন্ধ্যাগুলি আক্ষেপ ও দীর্ঘশ্বাসে ভরে ওঠে—

"কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁগো।
উঠিলে নব শশী, ছাদের' পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো!"
(বধূঃ ১২৯৫।। মানসীঃ ১২৯৭)

পাষাণ-নগরীতে রূপকথা শোনার অবকাশ কোথায়? পল্লী বালিকার ব্যথাটুকু রূপকথার উল্লেখে তীব্র হয়ে ওঠে।

'সোনারতরী'-র(১৩০০) 'বিম্ববতী' (১২৯৮) বিশ্ববিখ্যাত রূপকথা স্নো-হোয়াইট পদ্যরূপ। ঐ কাব্যের 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' (১২৯৮), 'নিদ্রিতা' (১২৯৯), এবং 'সুপ্তোত্থিতা' (১২৯৯) পদ্য-আশ্রয়ী রূপকথা। কবিতাগুলি তাঁর রূপকথা-প্রীতির নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের কলমে রূপকথাগুলি রূপান্তরিত।

'শিশু ভোলানাথ'-হর ( ) 'দুয়োরাণী' (১৩২৮) কবিতার দুয়োরাণী ও রাক্ষস কিংবা 'বাণী বিনিময়'-এ রাজপুত্তুর-দৈত্যপুরী-রাজকন্যা দুয়োরাণীর প্রসঙ্গ-অবতারণায় শিশু-মনস্তত্ত্বের কৌশলী উপস্থাপনা।

রূপকথার আদলে লেখা বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রীয় রূপকথার দৃষ্টান্তঃ 'গল্পগুচ্ছ'-ভুক্ত (১৩০৭) 'অসম্ভব কথা' (১৩০০), 'একটা আষাঢ়ে গল্প' (১২৯৯), 'লিপিকা'র (১৩২৯), 'রাজপুত্তুর', 'সুয়োরাণীর সাধ', 'বিদূষক', 'তোতাকাহিনী', 'উপসংহার', 'পুনরাবৃত্তি', 'রথযাত্রা', 'পরীর পরিচয়' প্রভৃতি।

বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির আর একটি শাখা হ'ল লোকগীতি। 'নদী' (১৩০২) কবিতায় নদীপথ সারিগীতিতে মুখরঃ

"সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি,
কত খেয়া-তরী দেয় পাড়ি।"

'শিশু ভোলানাথ'-এর (১৩২৯) 'রাজমিস্ত্রী' (১৩২৮) কবিতাতেও লোকগীতির প্রাসঙ্গিক অবতারণা ঘটেঃ

সমস্ত দিন ছাত-পিটুনী
গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি,
অনেক নিচে চলছে গাড়ি ঘোড়া।"

'অচলায়তন' (১৩১৯) নাটকের 'আমরা চাষ করি আনন্দে'— শ্রমগীতিতে লোকজীবনাশ্রয়ী শ্রমগীতিরই অনুসরণ।

'হাস্যকৌতুক' (১৩১৪) পর্যায়ের রচনা 'পেটে ও পিঠে'-তে (১২৯২) 'পেটে খেলে পিঠে সয়' প্রবাদের প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনস্বীকার্য। 'ব্যঙ্গ কৌতুক' (১৩১৪) পর্যায়ের রচনা 'স্বর্গীয় প্রহসন'-এ (১৩০১) লৌকিক দেবতা ঘেঁটুর সংলাপে প্রবাদ -প্রয়োগের দৃষ্টান্তঃ 'কথায় বলে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ'। লৌকিক দেবী শীতলার সংলাপে লৌকিক বাক্ বীতির প্রয়োগ চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণঃ

১। "মাইরি! তুমি এত ছলও জান ভাই! আমাকে আচ্ছা ভোগ ভুগিয়েছ যা হোক!"



ইন্দিরা, রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ

২। "বলি ও বড়ো মানুষের ঝি, তোমাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয় না বলে বুঝি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না!"

৩। "কত বদ্যির সাত পুরুষকে আমি সাত ঘাটের জল খাইয়ে এসেছি—আমি কি তেমনি মেয়ে!"

রবীন্দ্র-রচনায় লোকসংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলিও দুর্লক্ষ্য নয়। আপাতত আলোচনাটিকে লোকসংস্কৃতির দু'টি দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে উপসংহারে আসা যাক।

সংস্কৃতির দু'টি স্তর। প্রথমটি মৃত্তিকাশ্রয়ী লোকসংস্কৃতির স্তর। দ্বিতীয়টি সৌধস্তর—অভিজাত সংস্কৃতির স্তর। মৃত্তিকাস্তর আশ্রয়েই সৌধস্তরের উদ্ভব। উভয় স্তরের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আদান-প্রদানের পালাও অব্যাহত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্মমূলে লোক-সংস্কৃতির প্রভাব-প্রেরণা তাই দুর্লক্ষ্য নয়।

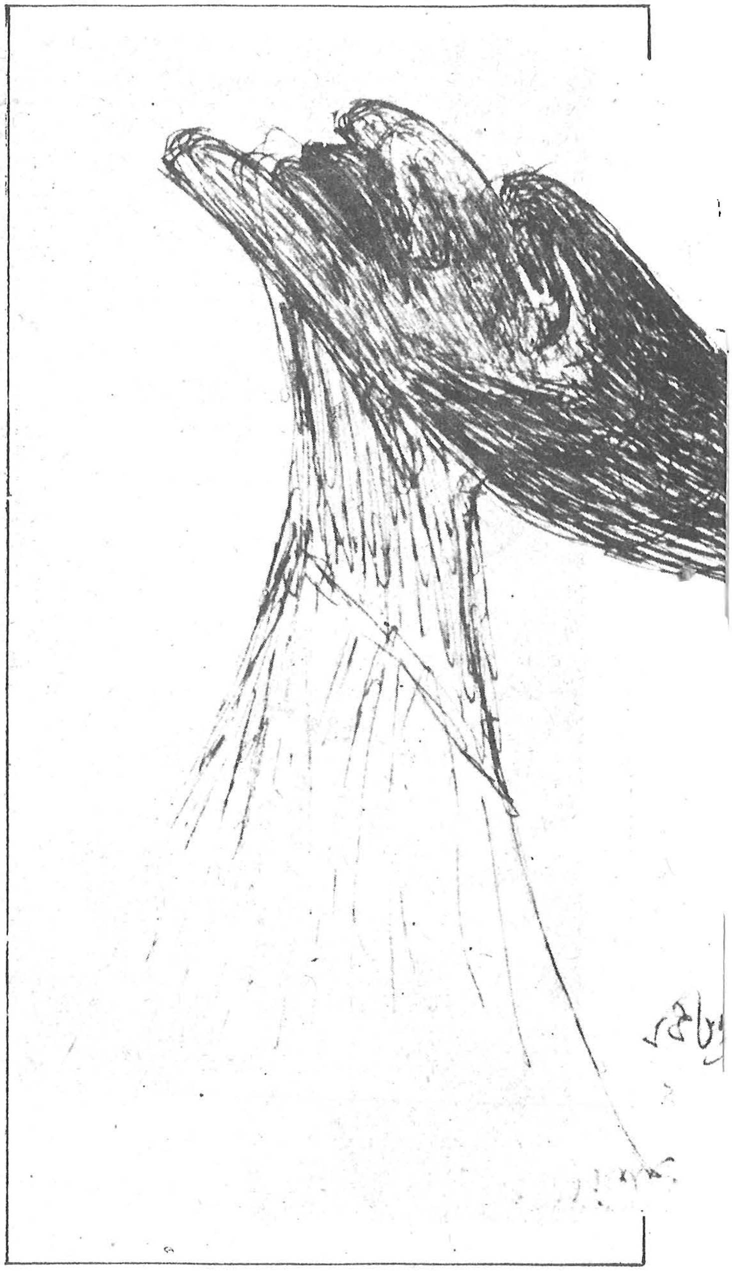
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লোকসংস্কৃতি মনস্ক। লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ সুবিদিত। এ অনুরাগের জন্ম পারিবারিক পরিবেশে, বিকাশ ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়ন-সূত্রে। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বা 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৩১২) প্রবন্ধে যেমন তার পরিচয় পাই, তেমনি পরিচয় পাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেয়েলি ব্রত' (১৩০৩), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৩১৪), বিভূতিভূষণ গুপ্তের 'বেড়াল ঠাকুরঝি' (১৩৩০) ইত্যাদি গ্রন্থের ভূমিকা রচনায়।

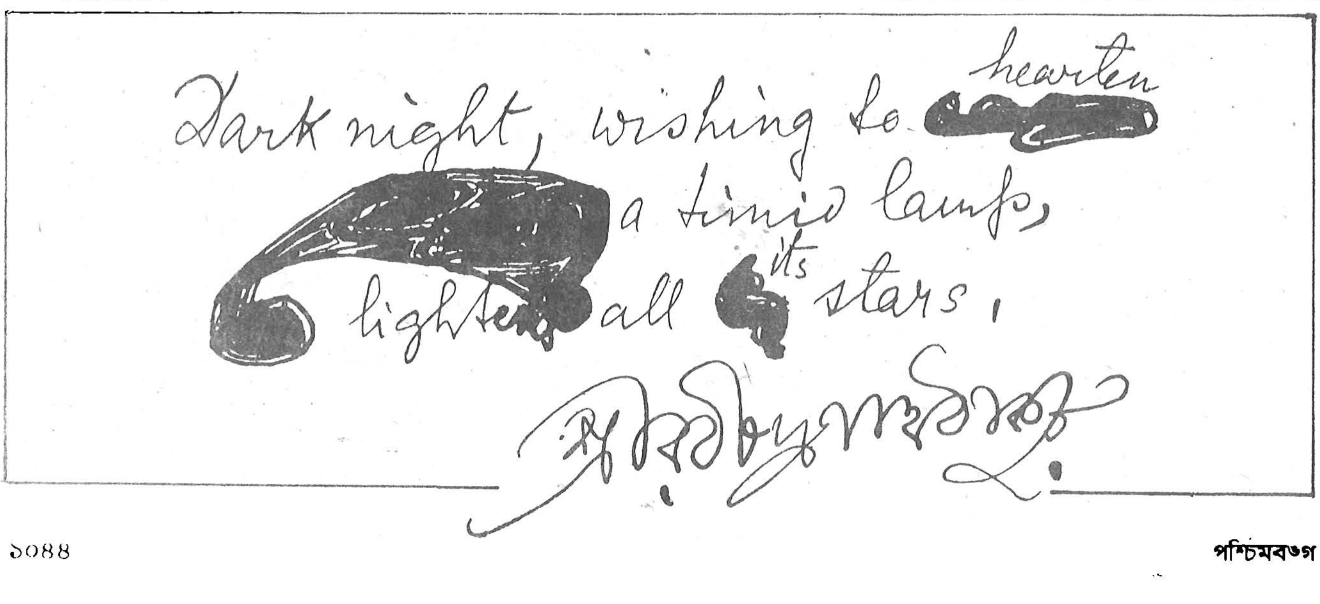
রবীন্দ্র-রচনায় লোকসংস্কৃতি কখনো উপকরণের মর্যাদাপ্রাপ্ত, কখনো বা প্রেরণা সঞ্চারী, নতুন সৃষ্টির উৎস।

লোকসংস্কৃতিকে এড়িয়ে গিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা তাই অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১. 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধ।
২. পূর্বোক্ত গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়াঃ ২' প্রবন্ধ।
৩. ছেলেভুলানো ছড়াঃ 'লোকসাহিত্য'।
৪. লালবিহারী দে সংকলিত 'ফোক-টেল্স অফ বেঙ্গল'- (১৮৮৩) দ্রষ্টব্য। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র (১৯০৭) 'পাতালকন্যা মনিমালা'-য় গল্পটির রূপান্তর লক্ষ্যনীয়।'
৫. দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে গল্পটি আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি অবশ্য 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রকাশের পূবেই রচিত।
৬. পরবর্তীকালে প্রকাশিত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'-র (১৯০৯) 'মালঞ্চমালা' গল্পটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।
৭-৮. দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র 'মধুমালা' গল্প স্মরণযোগ্য।
৯. সুপরিচিত 'মালঞ্চমালা' গল্পের রূপান্তর ও কৌতুকদীপ্ত সমালোচনা।



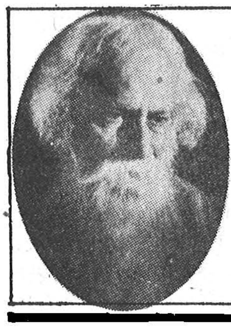




ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

নববর্ষ
১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



রবীন্দ্রনাথের নাট্য কাব্য

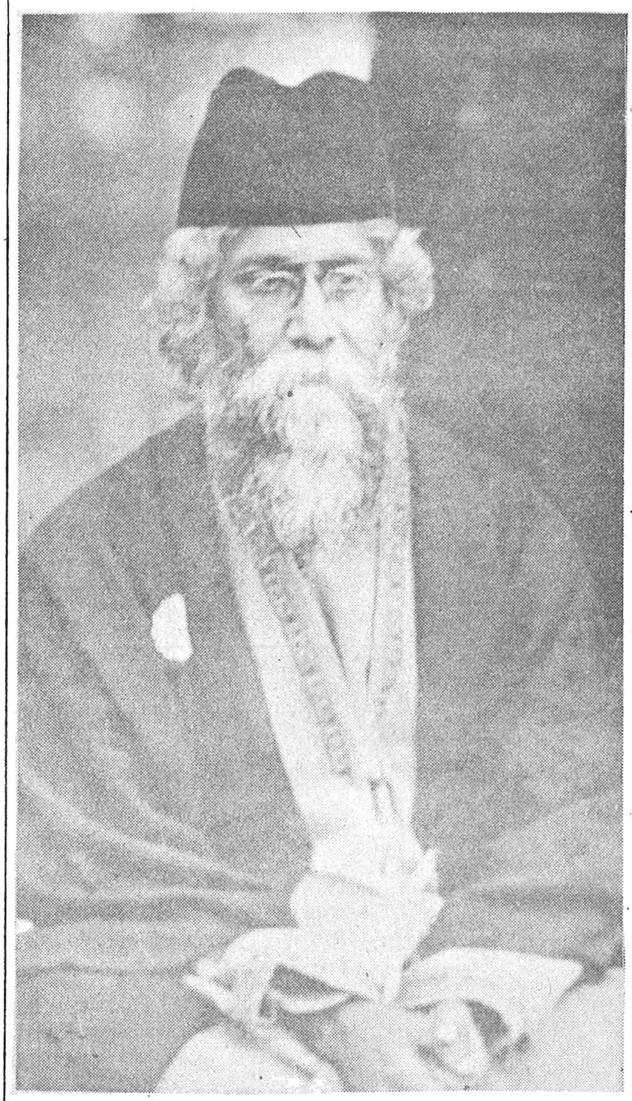
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য—নাটকের এই দু'টি বিভাগ খুব স্পষ্ট সংজ্ঞায় পৃথক করা যায় না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের যৌবনে রচিত বেশ কিছু লেখার কোন্‌টি কাব্যনাট্য আর কোন্‌টি নাট্যকাব্য তা নিয়ে সমালোচকরা ধাঁধাঁয় পড়ে যান। ফলতঃ যেটিকে একজন বলেন কাব্যনাট্য অন্যজন সেটিকে বলেন নাট্যকাব্য। আসলে এই দু'টি ধারার মধ্যে কবিতা ও নাটকীয়তা উভয়ই থাকে, তবে কোথাও কম কোথাও বেশী। সাধারণ পাঠক অবশ্য এই সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ নিয়ে কখনোই মাথা ঘামান না, তাঁরা এইটুকু চান, পূর্ণাঙ্গ নাটকের অঙ্ক, দৃশ্যবিভাগ গদ্য, সংলাপ এবং উপকাহিনী ইত্যাদির ভীড় না থাকুক—সংহত পরিসরে কাব্যমন ও সংলাপবহুল একটি নাট্যকর্ম জন্ম নিক্।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ তাই চেয়েছিলেন এবং উনিশশতকের শেষ দশকটি তিনি একটিমাত্র প্রহসন 'গোড়ায় গলদ' ছাড়া আর যা লিখেছেন সবই নাট্যকাব্য। আধারটি কবিতার কিন্তু নাটকীয়তার রস তাতে বাধা পায়নি, উদ্বেলিত হয়েছে, পাঠক দর্শককে রমণীয় আনন্দ দিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য Dramatic Poetry-এর মতো ঠিক নয়, কিন্তু বাংলায় এ এক অভিনব সৃষ্টি। যাত্রা কিংবা গীতাভিনয়ের আঙ্গিককেও এর উপর প্রভাব ফেলেনি। তেমনি রবীন্দ্রোত্তর যুগে, এই সাম্প্রতিককালেও যাঁরা নাট্যকাব্য লিখেছেন বা লিখছেন তাঁরা রবীন্দ্রপ্রভাবিত ঠিকই কিন্তু কি বিষয়, কি ভাষা—কোনো দিক থেকেই তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করতে পারেন নি।

এও লক্ষ্য করার বিষয় যে পূর্বে লেখা দু-তিনটি গীতিনাট্য ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাট্যকাব্যেরই বিষয় ভারতীয় পুরাণ। অথচ আশ্চর্য যেসব বিষয় নিয়ে তাঁর আগেই পৌরাণিক নাটকগুলি লেখা হল সেগুলিকে তিনি নাট্যকাব্যে আশ্রয় করলেন না। তার কারনও আছে। রবীন্দ্রনাথের মনে কোন 'পৌরাণিক' বিশ্বাস বিশেষ 'পার্বণবিধি' কখনোই ছাপ ফেলতে পারেনি। তাঁর নিজস্ব অধ্যাত্মবাদ মূর্ত হয়েছে পরবর্তীকালে লেখা একাধিক রূপক-সাংকেতিক নাটকে। ঐ নাটকাব্যে রবীন্দ্রনাথ মুক্তির পথটি খুঁজছিলেন এবং ১৮৯২ তে 'চিত্রাঙ্গদা' লেখা থেকে ১৯০০তে 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' লেখা পর্যন্ত কালপর্বে তাঁর নিজস্ব পুরাণ ভাবনা ব্যাপকতা লাভ করল। তিনি বেছে নিলেন পুরাণের কোনো উপেক্ষিত চরিত্রকে অথবা পৌরাণিক কোনো চরিত্রকে। ঘাত-প্রতিঘাত মুখর নাট্যকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিসরে যুক্ত করলেন নাট্যদ্বন্দ্ব। চরিত্রগুলির হৃদয়ে সিঞ্চন করলেন মানবীয় সুখদুঃখ। সুচির-প্রবাহিত ভক্তিরসের গতিতে যোগ করলেন যুক্তি-তর্কের।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলিতে প্রধান স্হান পেয়েছে সমকালীন পৌরাণিক নাটকের উপেক্ষিত চরিত্রসমূহ। অর্জুন-দয়িতা চিত্রাঙ্গদা, দুর্য্যোধন-জননী গান্ধারী, কচ-প্রেমিকা দেবযানী, অবাঞ্ছিত প্রথম পান্ডব কর্ণকে পুরাণের পাতা থেকে তুলে এনে মানবিক সুখদুঃখের প্রতীক করে তুললেন। নবদূর্বাদলশ্যাম কৃষ্ণভক্ত নীলধ্বজ, প্রহ্লাদ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, রাম-রাবণ এঁরা কেউই না, পুরাণের কোনো পরিচিত কাহিনীই নয়, রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু অর্বাচীন পুরাণ ও অপাংক্তেয় চরিত্র।



নাট্যকাব্যগুলির পরিসর ক্ষুদ্র হলে কি হবে, পুরাণের নব ব্যাখ্যা সেকালের শিক্ষিত বাঙালীকে আলোড়িত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ তীব্রভাষায় লিখেছিলেন 'ঘরে ঘরে বিদ্যা হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়, কিন্তু ঘরে ঘরে চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্নে যায়।' দ্বিজেন্দ্রলালের এই সমালোচনা

যে উদ্দেশ্যমূলক ছিল তা এখন সকলেই জানেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যদি তারাচরণের 'ভদ্রার্জুন' নাটকটির (১৮৫২) পাশাপাশি আলোচনা করতেন, তাহলে দেখতে পেতাম, অর্জুনের আরেক দয়িতা সুভদ্রা দেহলালসায় কোন্ পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে! কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অর্জুনকে প্রথম দেখে চিত্রাঙ্গদার প্রতিক্রিয়া ভিন্নতর—

"যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি
শৌর্যবীর্য যাহা কিছু ধুলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তার
চরণের তলে।"

মিলনের পর্যায়টিও রবীন্দ্রনাথ কাব্যময়ই রেখেছেন— "অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে"। অতঃপর যে চিত্রাঙ্গদা জেগে উঠেছে সে তারাচরণের সুভদ্রার মত ব্যক্তিত্বহীন নায়িকা নয়, মাতৃত্বের গর্বের পাশাপাশি নারীত্বের অধিকারও তার কাছে সমমূল্য।

আমি চিত্রাঙ্গদা
দেবি নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী
পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি
নই। অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি?
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমারে পাইবে তবে পরিচয়।

সুভদ্রা ও চিত্রাঙ্গদা দুজনেই অর্জুনের প্রেমিকা কিন্তু দুজনের তফাৎটি রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। এই সংযম কি দ্বিজেন্দ্রলালের "পাষাণী" নাটকে অহল্যার মধ্যে আছে? উৎসুক পাঠকেরা ইন্দ্রের প্রত্যাখ্যানে অসহায় অহল্যার দেহদানের অংশটি পড়ে দেখতে পারেন। ঠিক এই কারণেই বাঙালী পাঠক-দর্শকেরা চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিমত মানতে পারেন নি।

নাট্যকাব্যের ক্ষুদ্র অবয়বে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাই বোধ হয় রবীন্দ্রোত্তর কবিরা ভাল নাট্যকার না হওয়ায় সার্থক নাট্যকাব্য লিখতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ যেমন কবি তেমনি নাট্যকার। সেক্সপীয়রের নাটক, হেগেলের নাট্যতত্ত্ব এই সবই রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন— তাই তাঁর পক্ষে "বিদায় অভিশাপ" ও "গান্ধারীর আবেদনের" মতো ছোট নাট্যকাব্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে খুব বেশী অসুবিধা হয় নি। 'বিদায় অভিশাপে'—একদিকে কর্তব্যের আহ্বান অন্যদিকে প্রেমের মোহময় আকৃতি উভয়ের প্রবল দ্বন্দ্ব পাওয়া গেল। মাত্র আট-নয় পৃষ্ঠার নাটিকায় কি প্রবল দ্বন্দ্ব। দেবযানীর ব্যর্থ প্রতিহত প্রেম, বিষধর সর্পিণীর মতো সিদ্ধকাম কচকে দংশন করেছে,

তোমা পরে
এই মোর অভিশাপ, যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হইবে না বশ তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

—এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্যে দেবযানীর চরিত্রে কুমারী প্রেমের কৌতূহল, আশা, নৈরাশ্য, অভিমান, দহন ইত্যাদি একে একে সঞ্চিত করে রবীন্দ্রনাথ পুরাণের জগতে নাট্যদ্বন্দ্বের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। মধুসূদনের দেবযানী



'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ



এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা প্রণয়িণী এবং গৃহিণী দুই-ই। প্রেয়সী সত্তা তাদের জীবনের ভগ্নাংশ মাত্র—নিটোল পরিণাম নয়। রবীন্দ্রনাথের দেবযানী কেবলমাত্র প্রেয়সী। সে স্বর্গের মানবী। তাই বোধ হয় প্রেম স্বপ্নজাত আনন্দ, এবং প্রেম ভগ্নজাত বেদনা—আঘাতে সংঘাতে তার চিত্তকে অনবদ্য করে তুলেছে।

এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের বিস্ময়কর পরিচয় আছে 'গান্ধারী আবেদন' নাট্যকাব্যে—গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে। বাংলা নাটকে এই দুটি চরিত্র আরো বহু জায়গাতেই আছে কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে তার পুতুল মাত্র। এই ক্ষুদ্র নাটকে রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী সত্যধর্মের জয় চেয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন —

'ত্যাগ কর পাপ দুর্যোধনে।'

রবীন্দ্রনাথের শেষ নাট্যকাব্য 'কর্ণকুন্তিসংবাদ'। মহাভারতের সর্বাপেক্ষা দ্বন্দ্বমুখর চরিত্র কর্ণকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আগে আর কেউ যে নাটক লেখেননি তার কারণ কি রক্ষণশীল হিন্দুদের সম্পর্কে ভীতি ?

অথচ রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে অপরেশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, কেদারনাথ দেবতাড়িত কর্ণ চরিত্রে যে অশ্রুপ্রপাত বইয়ে ছিলেন পরবর্তী বাংলা নাটকে কর্ণ চরিত্রসৃষ্টিতে তাই কাজ করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' নাটকে অহল্যার প্রতি শতানন্দের মর্মভেদী উক্তি রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক অনুকরণ। ব্যতিক্রম কেবল গিরিশচন্দ্র। একই মাসে গিরিশচন্দ্রের 'পান্ডব-গৌরব' ও রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' লেখা হয়। অথচ আশ্চর্য গিরিশচন্দ্রের কর্ণে কোথায় দ্বন্দ্ব কোথায় কুন্তীর প্রতি ক্ষোভ ? গিরিশচন্দ্রের কর্ণ বলেছে,

অবতার উপদেষ্টা মম
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পান্ডবের আমি
উপস্থিত বিগ্রহে রক্ষিব জ্যেষ্ঠ সম।

আর রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যটিতে কর্ণের অভিমান ক্ষুব্ধ হৃদয় ব্যগ্র বাহু মেলে ধাবিত হয় জননীর দিকে।

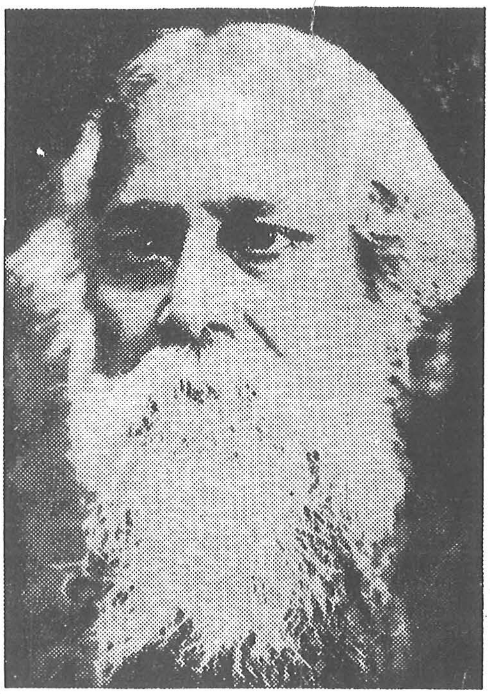
পুরাতন সত্য সম
"তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধ চিত্তে মম
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘিরিছে আজি।
কালি প্রাতে
আরম্ভ হইবে মহারণ, আজ রাতে
অর্জুন জননী কন্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর!"

কুন্তীর শতপ্রলোভনে, স্নেহের আকর্ষণে কর্ণ যে সাড়া দিল না তার মূলে রয়েছে তার জন্মরহস্য। মহাভারতের এই করুণতম চরিত্রটির মধ্যে যে নাট্য দ্বন্দ্ব সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। তাই কুন্তীর প্রতি কর্ণের সংলাপে চরিত্রটির রক্ত মুদ্রিত বেদনার শতদল উন্মোচন হল।

"জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন গৃহহীন—আজিও তেমনি
আমার নির্মম চিত্তে তেয়াগ জননী
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব পরে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের বিচিত্র শৈলীর সঙ্গে কেবলমাত্র ইংরাজ কবি টি এস এলিয়ট-এর নাট্যকাব্যের আঙ্গিকে হয়ত কিছু মিল আছে, তবে এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে অনন্য ও অননুকরণীয়—তাতে কো সন্দেহ নেই।





পঁচিশে বৈশাখ

"দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ-লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, আমাদের এক দেশ নয়।"

(পল্লীসেবা পল্লীপ্রকৃতি)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।
জানি কালসিন্ধু তারে
নিয়ত তরঙ্গঘাতে
দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।
আমার বিশ্বাস আপনারে।
দুই বেলা এই পাত্র ভরি
এ বিশ্বের নিত্যসুধা
করিয়াছি পান।
দুঃখভারে দীর্ণ করে নাই
কালো করে নাই ধূলি
শিল্পেরে আমার
আমি জানি যাব যবে সংসারের
রঙ্গভূমি ছাড়ি
সাক্ষ্য দিবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালবাসিয়াছি।
এ ভালবাসাই সত্য, এ জন্মের
দান। ২
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে
অস্বীকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও বসুমতী করপোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী